খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

রচনা

সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
ফাদার অনল টেরেন্স কস্তা, সিএসসি
ফাদার অসীম টি. গনসালভেস, সিএসসি
রবার্ট টমাস কস্তা

সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পাঠ্যপুস্ত ক প্রণয়নে সমন্বয়ক
ফেরিয়াল আজাদ

কম্পিউটার কম্পোজ
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
ব্রাদার শ্যামল জেমস গোমেজ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্ত কটি একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত জীবনাহ্বান ও ঈশ্বর কর্তৃক আহূত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও জীবনচরিত্র সন্নিবেশ করে পরিমার্জিত কারিকুলামের আলোকে রচনা করা হয়েছে। পরিত্রাতা যীশুর জীবন ও কাজগুলো জানা ও তাঁর পরিত্রাণে বিশ্বাসী হয়ে নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা, উদারতা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে অত্র পাঠ্যপুস্ত কটি রচনা করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্ত কটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্ত কটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্ত ক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্ত কটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্ত কটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্ত কটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্ত কটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	পবিত্র আত্মা	১–১০
দ্বিতীয়	ঈশ্বরের সৃষ্টির লালন	১১–১৯
তৃতীয়	ঈশ্বর ও মানুষ	২০–২৮
চতুর্থ	মানুষের পতনের ফল	২৯–৩৭
পঞ্চম	যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাব	৩৮–৪৯
ষষ্ঠ	ঈশ্বরের আহ্বানে পিতরের সাড়াদান	৫০–৫৮
সপ্তম	খ্রিষ্টমণ্ডলী	৫৯–৬৪
অষ্টম	যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য	৬৫–৭২
নবম	ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম	৭৩–৮৬
দশম	ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী	৮৭–১০০

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

ইতিপূর্বে আমরা পবিত্র ত্রিত্ব সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জেনেছি যে ঈশ্বর মাত্র একজন, কিন্তু এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন। এই অধ্যায়ে আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। তিনি পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরেরই আত্মা। পবিত্র আত্মা জগতের শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিলেন, এখনও আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বে তিনি শিষ্যদের উপর অবতরণ করেছেন ও বিশ্বাসের শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রেরিত শিষ্যদের শক্তি দান করেছেন। পবিত্র আত্মা হলেন সহায়ক আত্মা যিনি আমাদের সকলকে পবিত্র রাখেন ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও পরিপক্ব করেন।

পবিত্র আত্মার অবতরণ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পঞ্চাশত্তমী দিনে প্রেরিত শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- পবিত্র আত্মার দান ও দানের ফলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খাঁটি খ্রিষ্টীয় জীবন গঠনে পবিত্র আত্মার দানগুলোর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করব।

পাঠ ১ : পবিত্র আত্মার অবতরণ

যীশুর পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পর প্রেরিত শিষ্যেরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করলেন। এই পঞ্চাশ দিন তারা ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। একটি ঘরের মধ্যে তখন তাঁরা একসঙ্গে বাস করতেন। সেখানে তাঁরা একত্রে দিনরাত প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। কেউ বা আবার নিজ নিজ পেশায় ফিরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন; কেউ কেউ জাল নিয়ে মাছ ধরতেও গিয়েছিলেন। শিষ্যদের সঙ্গে পুনরুত্থিত যীশু বেশ কয়েকবার দেখা দিয়েছিলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁরা যীশুকে চিনতে পারেননি কিন্তু পরে চিনতে পেরেছিলেন। খ্রিস্টের পুনরুত্থানে তাঁরা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। প্রভু যীশু তাঁদের সাহস দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের জন্য এক সহায়ক আত্মাকে পাঠিয়ে দেব, তিনি তোমাদের সব কিছু স্মরণ করিয়ে দেবেন।"

খ্রিস্টের স্বর্গারোহণের দশ দিন পর, পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যেরা সকলে এক জায়গায় সমবেত রয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো একটা শব্দ। যে বাড়িতে তাঁরা বসে ছিলেন, সে বাড়িটি সেই শব্দে ভরে উঠল। তারপর তাঁরা দেখতে পেলেন, অগ্নিজিহ্বার মতো দেখতে কী যেন তাঁদের প্রত্যেকের মাথার ওপর নেমে এসে অধিষ্ঠিত হলো। তাঁদের সকলেরই সারা অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। তাঁরা নানা বিদেশি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন– পবিত্র আত্মা যাঁকে যেমন বাকশক্তি তখন দিচ্ছিলেন, সেই মতোই।

আকাশতলের প্রতিটি দেশের বহু ভক্ত ইহুদি তখন যেরুসালেমে বাস করত। সেই শব্দ শোনা যাওয়ার সাথে সাথেই সেখানে ভিড় জমে গেল। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাষায় শিষ্যদের কথা বলতে শুনে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে, বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল : 'ওই যে, যারা কথা বলছে, ওরা সকলে কি গালিলেয়ার লোক নয়? তাহলে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মাতৃভাষায় ওদের যে কথা বলতে শুনছি, এটা কী করে সম্ভব হলো? আমাদের মধ্যে পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের লোক আছে; আছে মেসোপটেমিয়া, যুদেয়া আর কাপ্পাদোসিয়ার অধিবাসী এবং পন্তাস ও এশিয়া, ফ্রিজিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর এবং লিবিয়ার সাইরিনি অঞ্চলের লোক। তাছাড়া রোমের যেসব লোক এখানে এসে কিছু দিন ধরে রয়েছে ইহুদি ও ইহুদি ধর্মাবলম্বী, দুই-ই– তারাও আছে এবং ক্রীট দ্বীপ ও আরব দেশের লোকেরাও আছে। অথচ আমরা সকলেই শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজের নিজের ভাষায় পরমেশ্বরের মহান কর্মকীর্তি ঘোষণা করছে।' তারা সকলেই তখন স্তম্ভিত। কী যে ঘটছে, তা বুঝতে না পেরে, তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগল : 'এই ব্যাপরটার মানে কী?' কেউ কেউ আবার বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, 'মিঠে মদ খেয়ে ওরা, দেখছি, নেশায় ভরপুর।'

কিন্তু পিতর তখন এগারোজন প্রেরিত দূতের সঙ্গে, সেখানে দাঁড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলেন, 'শোন, যুদেয়ার মানুষেরা, আর শোন তোমরাও সকলে, যারা এই যেরুসালেমে বাস করে থাক। এই ব্যাপারটা তোমাদের বোঝা চাই– আমার কথাগুলো তোমরা মন দিয়েই শোন। তোমরা এদের সম্বন্ধে যা ভাবছ, তা কিন্তু সত্যি নয়; এরা মোটেই মাতাল নয়। এখন তো সবে নয়টা। আসলে সেই ঘটনাই আজ ঘটল, যার কথা প্রবক্তা যোয়েল আগেই জানিয়েছিলেন।" (প্রেরিত ২:১-১৬)।

এইভাবে শিষ্যেরা পঞ্চাশত্তমী দিনে পবিত্র আত্মাকে লাভ করলেন। উপস্থিত সকলে তাদের ভুল বুঝলেও তারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় শক্তি লাভ করে মানুষের ভুল শোধরাতে পেরেছিলেন। তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে, শিষ্যেরা মাতাল ছিলেন না বরং পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁদের ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। যে পিতর ভয়ে অন্য শিষ্যদের সাথে উপরের ঘরে ছিলেন, সেই পিতর সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সাহসের সাথে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি খ্রিষ্টকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করার জন্য ইহুদিদের দায়ী করেছিলেন। পিতর এই সাহস পেয়েছেন পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে। কারণ তিনি সত্যময় আত্মা। সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য তিনি সাধু পিতরকে প্রেরণা দিয়েছেন। সাধু পিতরের স্পষ্টভাবে সত্য কথা প্রচারের ফলে সেদিন বহু মানুষ দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন।

কাজ : শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসার পর তাদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল সেগুলো তালিকাবদ্ধ কর।

পাঠ ২ : পবিত্র আত্মার প্রেরণা

আমাদের মধ্যে যারা দীক্ষাস্নান, খ্রিষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছে, তারা জানে, এই সাক্রামেন্তগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে নতুন করে লাভ করেছি। আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। এই পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

দীক্ষাস্নানে আমরা দীক্ষাদাতার দ্বারা ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত হয়েছি। তাছাড়া আমরা প্রার্থনা বা কাজের শুরুতে ও শেষে নিজেদেরকে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত করি। আমরা স্মরণ করি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাকে। ক্রুশের চিহ্নের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যকে স্মরণ করি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে যে এক ঈশ্বর, তাই হলো ত্রিত্বের রহস্য। এই রহস্যটি এমন একটি বিষয় যা আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না। যেটুকু বুঝতে পারি তা সম্ভব হয় গভীর বিশ্বাস, প্রার্থনা ও ভালোবাসার মাধ্যমে। কারণ পরমেশ্বর যে প্রেমস্বরূপ (১ যোহন ৪:৮)। এই ভালোবাসা পিতা ঈশ্বর সৃষ্টি কাজে, পুত্র ঈশ্বর পরিত্রাণ কাজে এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর প্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

"প্রেরণা" শব্দটি পবিত্র আত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আভিধানিক অর্থে প্রেরণা হলো উৎসাহ, প্রবল উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা, প্রবৃত্তি বা বিশেষ কোনো কর্মসম্পাদনের জন্য মানুষের অন্তরের শক্তি। খ্রিষ্টধর্মে এই প্রেরণা হলো ঐশ বা দৈব শক্তি। এই শক্তি বা প্রেরণার উৎস হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তিনি এই বিশ্বজগতের প্রভু। সৃষ্টি থেকেই তিনি মানব মুক্তির মহাপরিকল্পনা করে রেখেছেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন আত্মার মাধ্যমে শক্তি ও পুত্রের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সাধু ইরেনিয়াস বলেন, "দীক্ষাস্নান আমাদেরকে পুত্রের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা পিতা ঈশ্বরে নবজন্ম

লাভের কৃপা দান করে। কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মাকে লাভ করে তারা বাণী অর্থাৎ পুত্রের দিকে চালিত হয় এবং পুত্র তাদেরকে পিতার কাছে নিবেদন করেন, আর পিতা তাদের দান করেন অনশ্বরতা। আর পবিত্র আত্মার মাধ্যম ব্যতীত পুত্রকে দেখা অসম্ভব এবং পুত্রকে ছাড়া কেউই পিতার নিকট যেতে পারে না। কারণ পুত্র হচ্ছেন পিতা-সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ঈশ্বর-পুত্রের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে।"

সাধু পল বলেন, পবিত্র আত্মার প্রেরণা ছাড়া কেউ বলতে পারে না যীশু "প্রভু"(১ম করি ১২:৩)। পবিত্র আত্মাই অন্তরে শক্তি বা প্রেরণা যোগান ঈশ্বরকে জানতে ও বিশ্বাসে দৃঢ় হতে। মানুষের অন্তরে এই পবিত্র আত্মাকে দান করেন স্বয়ং ঈশ্বর। দুর্বল চিত্তের মানুষ যেন ঈশ্বরের পানে ধাবিত হতে পারে তার প্রেরণা বা শক্তি পবিত্র আত্মাই যুগিয়ে দেন। তিনি মানুষের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন। তাই পবিত্র আত্মার সাথে মানুষের সম্পর্ক রাখতে হয়। এর মধ্য দিয়ে পুত্র ও পিতার কাছে যাওয়া যায়। কারণ পবিত্র আত্মার উৎপত্তি পিতার নিকট থেকে আর তার প্রকাশ পুত্রের মাধ্যমে। তাই পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমরা পিতা ও পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি, বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারি এবং ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই বিশ্বাসের রহস্যে আমরা বেড়েও উঠতে পারি।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে আমরা প্রথমে দীক্ষাস্নান সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে লাভ করি। আদি পাপের কলুষতা থেকে মুক্ত হই, জীবন পাই, ঐশ কৃপা বা প্রসাদ পাই, বিশ্বাস গ্রহণ করি এবং ঈশ্বর সন্তান হিসেবে পরিচয় লাভ করি। এভাবে আমরা পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করি। হস্তার্পণ সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ করি। ফলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে আমরা খ্রিস্ট সম্বন্ধে জানতে পারি। পবিত্র আত্মাই আমাদের অন্তরে সেই আলো জ্বালিয়ে দেন যেন আমরা খ্রিস্টকে জানতে পারি ও বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পারি।

বিশ্বাস মন্ত্রে আমরা স্বীকার করি যে আমরা "পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি।" তার অর্থ হলো আমরা পবিত্র আত্মাকে এক ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করি। তিনি পিতা ও পুত্রের আত্মা এবং আদি থেকেই বিদ্যমান। তিনি পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে পূজিত ও গৌরবান্বিত। মানব জাতির মুক্তি পরিকল্পনায় তিনি পূর্ব থেকেই পিতা ও পুত্রের সাথে সক্রিয়।

শিষ্যদের উপর অবতরণের মধ্য দিয়ে তিনি একজন ব্যক্তি হিসেবে মণ্ডলীতে উপস্থিত। তিনি সর্বদা আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন যেন আমরা সত্য পথে পরিচালিত হতে পারি। পবিত্র আত্মার দেওয়া প্রেরণাতেই আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে এবং যীশুকে মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করতে পারি। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে জীবন যাপন করতে পবিত্র আত্মাই আমাদের জন্য শক্তি ও সাহস যোগান। তিনিই আমাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা প্রলোভনে বিশ্বাসে অটল থাকার শক্তি দেন। তিনিই আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ-বিভেদের স্থলে একতা, শান্তি ও ন্যায্যতা স্থাপন করেন।

পাঠ ৩ : পবিত্র আত্মার দান ও ফল

ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন দান বা শক্তি দিয়েছেন। তার এই দান দ্বারা আমরা নিজেদের বুঝতে পারি ও সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারি। তাঁর এই দানে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাই, মানবিকভাবে গঠিত হই, মণ্ডলী ও সমাজে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হই এবং ঈশ্বরের মনোনীত বা আপন জন হয়ে উঠি।

অনুরূপভাবে পরস্পরের মঙ্গল সাধনের জন্য ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন সেবাকাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যেমন মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা, রোগীদের সুস্থ করে তোলা, পাপীদের ফিরিয়ে আনা এবং এরকম আরও বিভিন্ন কাজ। এসব সেবাকাজের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে যুক্ত থাকি। তাছাড়া আমরা একে অপরের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকি এবং ভালোবাসা ও সেবার মানুষ হয়ে উঠি। এগুলো সবই মানুষের অন্তরে দান করেন পবিত্র আত্মা। এক একজনের অন্তরে এক একভাবে পবিত্র আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন।

পবিত্র আত্মার বারোটি ফল

সাধু পল বলেন, "নানা দিব্য দান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবাকর্মও আছে, তবে যাঁকে সেবা করা হয় সেই প্রভু কিন্তু এক। নানা কর্মক্রিয়াও আছে, তবে সকলের অন্তরে সব-কিছুই যিনি করে থাকেন, সেই পরমেশ্বর কিন্তু এক। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্যে। একজনকে পবিত্র আত্মা দান করেন প্রজ্ঞার ভাষা, আর একজনকে সেই পবিত্র আত্মাই দান করেন ধর্মজ্ঞানের ভাষা; অন্য একজনকে দান করেন পরম বিশ্বাস। কাউকে আবার সেই একই আত্মা দান করেন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, কাউকে নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা, কাউকে প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার ক্ষমতা, কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা, কাউকে নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, অন্য কাউকে আবার সেই সব ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সমস্ত কিছুই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ; তাঁর আপন ইচ্ছামতো তিনি এক একজনকে এক এক বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন।

"তুলনা করে বলা যেতে পারে; আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক। দেহের অঙ্গগুলো অনেক হয়েও সব কয়েকটি মিলে এক দেহ-ই হয়। খ্রিষ্টও ঠিক তেমনি। কারণ একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি– তা আমরা ইহুদি বা অনিহুদি, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ, যা-ই হই না কেন; এবং সেই একই আত্মার উৎস থেকে আমাদের সকলকেই পান করতে দেওয়া হয়েছে। দেহ কেবলমাত্র একটি অঙ্গ নিয়ে নয়, অনেক অঙ্গ নিয়েই গঠিত।" (১ করি ১২:৪-১৪)।

একই পত্রে সাধু পল আরও বলেন, "এখন, তোমরা সবাই মিলে খ্রিস্টেরই দেহ; তোমরা এক একজন সেই দেহের এক একটি অঙ্গ। পরমেশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমে আছেন প্রেরিত দূতেরা, তারপর প্রবক্তারা, তারপর শিক্ষাগুরুরা, তারপর রয়েছেন তাঁরাই যাঁদের তিনি দিয়েছেন নানা অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা বা রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, কিংবা পরকে সাহায্য করার বিশেষ গুণ বা তাদের পরিচালনা করার বিশেষ ক্ষমতা, অথবা নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা।" (১ করি ১২:২৭-২৮)।

পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের জন্য পরমেশ্বরের দান। সৃষ্টির শুরু থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সেই দানকে মানুষের জন্য দেওয়া হয়েছে। পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের প্রাণবায়ু যা প্রতিটি প্রাণীর অস্তি ত্ব ও জীবনের উৎস। পবিত্র আত্মার ফলেই পাপ ও কালিমা সত্ত্বেও মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। এই মানুষকে কালে কালে বিভিন্ন পর্যায়ে ঈশ্বর রক্ষা করেছেন ও শক্তি দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজে মানুষের কাছে দান হয়ে উঠেছেন। পবিত্র আত্মার দানে মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে ঈশ্বর ও পরস্পরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে ও ফলবান হয়ে ওঠে। বাইবেলে বর্ণিত উল্লিখিত অংশ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি মানুষের জীবনে পবিত্র আত্মার অনেক দান রয়েছে। এই দানগুলোকে সাতটি নামে উল্লেখ করা যায়।

পবিত্র আত্মার সাতটি দান

(১) প্রজ্ঞা (২) বুদ্ধি (৩) বিবেক (৪) মনোবল (৫) জ্ঞান (৬) ধর্মানুরাগ ও (৭) ঈশ্বর-ভীতি। গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল বলেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা যে-ফসল ফলিয়ে তোলেন, তা হলো : ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ত তা, কোমলতা আর আত্মসংযম। এমন-সব গুণের বিরুদ্ধে কোনো বিধান থাকতেই পারে না।" (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

আমাদের জীবন ও চরিত্রের সমস্ত ভালো কিছু কিংবা সকল সৌন্দর্য, আমাদের জীবনে যা কিছু খ্রিস্টময় সবই পবিত্র আত্মার কাজ। এর সবই আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফল। তিনি আমাদের প্রেরণা যোগান যেন আমরা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হতে পারি। ভালোবাসা, আনন্দ ও শান্তিতে পরিপ্লুত হই। সাধু পল গালাতীয়দের কাছে তাঁর কথাগুলোর মধ্য দিয়ে একথাই প্রকাশ করেছেন। রোমীয়দের কাছে পত্রের বিভিন্ন জায়গায় তিনি এই একই ফলের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত ফলগুলো কত সুন্দর, কতই না মধুর! এগুলো কে না চায়! এরূপ ফলে ফলশালী হতেও বা কে না চায়! এ যেন খ্রিস্টময় হয়ে ওঠা, যেন স্বর্গের নাগরিক হয়ে ওঠা! আমরা তো এই ফলগুলোর জন্যই প্রত্যাশী। এই ফলগুলো পাই একমাত্র পবিত্র আত্মারই ফলে।

সাধু পিতর বলেন, "তাই তোমাদেরও আপ্রাণ চেস্টা করে এখন তোমাদের ভগবদবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সুচরিত্রতা, তেমনি, সুচরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠতা, নিষ্ঠতার সঙ্গে ধর্মশীলতা, ধর্মশীলতার সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, আর ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে সর্বজনে ভালোবাসা।" (২ পিতর ১:৫-৭)।

আমাদের জীবনে চরিত্র গঠনের জন্য আমরা নিজের শক্তিতে কাজ করতে পারি না। যদি না পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে কাজ করতে দেই। সাধু পিতর তার পত্রের মাধ্যমে আমাদের আহ্বান জানান আমরা যেন আপ্রাণ চেস্টা করি এই গুণগুলোকে আমাদের জীবনে ফলশালী করতে। এর জন্য আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে

হবে পবিত্র আত্মার কৃপা ও দয়ার উপর। কারণ পবিত্র আত্মাই আমাদের জীবনে প্রেরণা যোগান ধর্মের পথে চলতে।

আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার ফলগুলোকে বারোটি নামে উল্লেখ করা যায়।

(১) ভ্রাতৃপ্রেম (২) আনন্দ (৩) শান্তি (৪) সহিষ্ণুতা (৫) করুণা (৬) সৌজন্য (৭) ধৈর্য (৮) মৃদুতা (৯) বিশ্বস্ত তা (১০) লজ্জাশীলতা (১১) সংযম ও (১২) বিশুদ্ধতা।

কাজ : পবিত্র আত্মার দান ও ফলগুলো একে একে মুখস্থ বল ও খাতায় লেখ।

পাঠ ৪ : পবিত্র আত্মা সান্ত্বনাদাতা

মুক্তির ইতিহাসে পবিত্র আত্মার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র আত্মা পিতার প্রাণবায়ু হিসেবে ছিলেন। এ জগতে ভালোমন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার উপায় পবিত্র আত্মাই মানুষকে দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় প্রবক্তা, বিচারক বা রাজাদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা কথা বলেছেন। পবিত্র আত্মারই প্রভাবে মারীয়া গর্ভবতী হয়েছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহনের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাই মানুষকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরূপ যা যা ঘটেছে সবস্থানেই পবিত্র আত্মার প্রকাশ ঘটেছে।

পবিত্র আত্মাকে দেখা যায় না। যুক্তিতর্ক দিয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং পবিত্র আত্মার কাজ সবই দৃশ্যমান। কারণ তিনি সত্যময় আত্মা। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা সত্যকে জানতে পারি।

পবিত্র আত্মা বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রভু যীশু পবিত্র আত্মাকে "সহায়ক" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার অর্থ হলো "যিনি কারও পক্ষে থাকার জন্য আহূত।" এ জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাবার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একজন সহায়ক আত্মাকে প্রেরণ করবেন। তিনি তাঁদের সাথে সাথে থাকবেন ও তাঁদের পরিচালিত করবেন। যীশুর কথামতো তাই ঘটল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে সহায়ক আত্মা শিষ্যদের উপর অবতরণ করলেন। তাঁদের সান্ত্বনা ও শক্তি দিলেন। তাই পবিত্র আত্মা হলেন সান্ত্বনাদাতা। আসলে প্রভু যীশু নিজেই প্রথম সান্ত্বনাদাতা। তিনি শিষ্যদের একা থাকতে দিলেন না। তাদের ছত্রভঙ্গ হতে দিলেন না। বরং তাদেরকে একত্রিত থাকতে সাহায্য করলেন এবং তাদের সান্ত্বনা দিলেন।

পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষভাবে সাধু পল ও পিতরের পত্রাবলিতে পবিত্র আত্মাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেমন প্রতিশ্রুত আত্মা, খ্রিস্টের আত্মা, প্রভুর আত্মা, ঈশ্বরের আত্মা। প্রভুর আত্মার উপস্থিতি মন্ডলীতে আমরা বিভিন্নভাবে দেখে থাকি। বিভিন্ন সাক্রামেন্তে আমরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও তাঁর কাজ বিশ্বাস করি। বিভিন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে যেমন জল, তেল লেপন, আগুন, মেঘ ও আলো; তাছাড়া মুদ্রাঙ্কন, হস্ত , অঙ্গুলি, কবুতর এগুলোর মধ্যে আমরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজ বিশ্বাস করি। এগুলোর মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার প্রকাশ ও কৃপা নিত্য বর্ষিত হয়। এই পবিত্র আত্মাই আমাদের নিত্য সহায়ক ও সান্ত্বনা যিনি সর্বদা মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন।

কাজ : জোড়ায় জোড়ায় আলাপ করে পবিত্র আত্মাকে সান্ত্বনাদাতা বলার কারণ খুঁজে বের কর

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র ত্রিত্বের ... ব্যক্তি।

২. প্রথম অবস্থায় তাঁরা ... চিনতে পারেননি কিন্তু পরে চিনতে পেরেছিলেন।

৩. আকাশতলের প্রতিটি দেশের বহু ভক্ত ইহুদি তখন ... যেরুসালেমে বাস করত।

৪. 'প্রেরণা' শব্দটি পবিত্র আত্মার সঙ্গে ... জড়িত।

৫. ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন দান বা ... দিয়েছেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পবিত্র আত্মা পিতা ঈশ্বর ও	• তিনি সাধু পিতরকে প্রেরণা দিয়েছেন
২. একটি ঘরের মধ্যে তখন	• তাদের ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল
৩. পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে	• পুত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন
৪. সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য	• তাঁরা এক সঙ্গে বাস করতেন
৫. যীশু সকল শক্তি ও	• মহাপরিকল্পনা করে রেখেছেন
	• ক্ষমতার উৎস

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পবিত্র আত্মা পবিত্র ত্রিত্বের কততম ব্যক্তি–

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. অদ্বিতীয়

২. কীভাবে প্রেরিত শিষ্যরা মানুষের ভুল শোধরাতে পেরেছিলেন ?

ক. পবিত্র আত্মার প্রেরণায় খ. নিজ শক্তি বলে

গ. বাণী প্রচারের অনুপ্রেরণায় ঘ. নিজের প্রেরণায়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

পড়ালেখা শেষে নিবিড় একটি বায়িং অফিসে ক্যাশিয়ার পদে কাজে যোগ দেন। সে নিয়মিত কাজে যায়। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করে। অন্য অনেক কর্মী তাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে মন্দ কাজের প্রস্তাব করলে তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এ ব্যাপারে তিনি ছোটবেলা থেকেই তার পরিবারের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

৩. কার ইচ্ছায় নিবিড় পরিচালিত হয়?

ক. ভাববাদীগণের খ. বন্ধুবান্ধবদের

গ. পবিত্র আত্মার ঘ. শিক্ষকদের

৪. নিবিড়ের এ ধরনের কাজ সাধারণ মানুষকে করে তুলতে পারে–

i. আধ্যাত্মিকতায় বলীয়ান

ii. মানবিকভাবে সুগঠিত হতে

iii. ঈশ্বরের আপনজন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পবিত্র হৃদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমিগ্রেশনে আমেরিকা চলে গেলেন। এবার বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বিশপ মহোদয় ঐ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক সেবাস্টিয়ানকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিতে বলেন। বিদ্যালয়টি স্থানীয় প্রভাবশালীদের কারণে খুবই বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলছিল। এমতাবস্থায় তিনি বিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি আতঙ্কিত ছিলেন। তিনি বাড়ি গিয়ে ঈশ্বরের নিকট শক্তি প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের নিকট থেকে তিনি তার প্রার্থনার সাহস ও অনুপ্রেরণা পান। এজন্যে পরের দিন তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে বিশপ মহোদয়ের নিকট স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ক. পঞ্চাশত্তমী পর্বে কে শিষ্যদের উপর অবতরণ করেন?

খ. যীশুর প্রেরিত শিষ্যরা বিদেশি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন কেন?

গ. সেবাস্টিয়ানের কাজে পবিত্র আত্মার কোন দানটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সেবাস্টিয়ানের কাজের মধ্যে পবিত্র আত্মার সব কয়টি ফলই বিদ্যমান আছে বলে কি তুমি মনে কর– তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।

২. কৃষ্ণনগর ধর্মপল্লীর খুব বিখ্যাত দুইজন লোক হলেন রমণ বর্মণ এবং প্যাট্রিক গমেজ। রমণ বর্মণ খুবই ধর্মভীরু এবং উত্তম প্রচারক। তার আধ্যাত্মিকতার কারণে অনেক লোক তার বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হয়। তিনি সর্বদা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত হতে উৎসাহিত করেন। তিনি রোগীদের আরোগ্যলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাদের সেবা দেন। রমণের পাশাপাশি প্যাট্রিক গমেজও সমাজের

নেশাগ্রস্ত এবং বিপথগামী লোকদেরকে নানাভাবে ভালো কাজের পরামর্শ দিয়ে সুপথে ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কারা যেরুসালেমে বাস করত?

খ. আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি কেন?

গ. রমণ বর্মণ কিসের প্রেরণায় তার কাজ পরিচালনা করেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রমণ বর্মণ ও প্যাট্রিক গমেজ তাদের ভালোকাজের ক্ষমতা একই ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে'– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পবিত্র ত্রিত্ব বলতে কী বোঝায়?

২. প্রেরিত শিষ্যরা কীভাবে পবিত্র আত্মাকে লাভ করে?

৩. আমরা কীভাবে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত হয়েছি?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তির পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যা জান লেখ।

২. পঞ্চাশত্তমী দিনে প্রেরিত শিষ্যদের উপর আত্মা অবতরণের ঘটনা বর্ণনা কর।

৩. পবিত্র আত্মার দান ও দানের ফলগুলো ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের সৃষ্টির লালন

ঈশ্বর তাঁর নিপুণ হাতে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সৃষ্টিই অতি উত্তম। আর মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে। মানুষকে দিয়েছেন সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব করার অধিকার। দাসত্ব নয় বরং ভালোবেসে তিনি যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে। তাই সকল সৃষ্টির যত্ন নেওয়া মানুষের একটি দায়িত্ব। ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিকে লালন করা আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র কর্তব্য।

ঈশ্বর সবকিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে লালনপালন ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন করার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও যত্ন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী হবো।

পাঠ ১ : সৃষ্টির লালন ও সংরক্ষণ

মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্য গুরুত্বপূর্ণ। আগে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনেছি। ঈশ্বর মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে জগতে পূর্ণতা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা।

তাঁর সকল সৃষ্টিই উত্তম। আমরা এই বিষয়ে আগে বিশদভাবে জানতে পেরেছি। মানুষ হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, অতি উত্তম। মানুষকে তিনি দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা। ঈশ্বর যখন মানুষের জন্য সবকিছু উত্তম করে সৃষ্টি করলেন তখন সেগুলোর যত্ন তো আমাদের অবশ্যই নিতে হবে। কারণ এটা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বর্তমান বাস্ত বতায় আমরা সৃষ্টির সেই উত্তমতাকে হারিয়ে ফেলছি। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষা করার উপায় জানার পূর্বে আমাদের জানা দরকার কীভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, কীভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তমতা ধ্বংস হচ্ছে।

কাজ : ঈশ্বরের সৃষ্টি দূষিত হওয়ার ৫টি কারণ লেখ।

পাঠ ২ : পরিবেশ দূষণ

ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তমতা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে। ফলে সৃষ্টির সৌন্দর্য বিনষ্ট হচ্ছে। তার একটি অন্যতম কারণ হলো মানুষের পাপ। বিশেষত মানুষের স্বার্থপরতার ফলে সৃষ্টির সৌন্দর্য কলুষিত হচ্ছে। সেই মানুষেরই জন্য আজ দূষিত হচ্ছে সৃষ্ট প্রকৃতি ও ধরিত্রী। আমাদের আলোচনা থেকে এর অনেক কারণ আমরা খুঁজে পাই।

নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কেনিয়ার ওয়ানগারি বলেছেন, "ঈশ্বর যদি মানুষকে প্রথম দিনই সৃষ্টি করতেন, অন্যান্য সৃষ্টির সেবা-যত্ন না পেয়ে সে পরের দিনই মরে যেত।" এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। আমরা অনেক সময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেই না। এর কারণ হলো, আমরা উপলব্ধি করতে পারি না কীভাবে সৃষ্টি আমাদের যত্ন নিচ্ছে। তাই সৃষ্টিকে যেমন খুশি তেমনভাবে ব্যবহার করছি। নিজের স্বার্থে সৃষ্টির অপব্যবহার করছি।

সৃষ্টির সেই প্রথম যুগে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে এবং মানুষ ও সৃষ্টির সমস্ত কিছুর সাথে সুন্দর মিলন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মানুষের পাপের কারণে সেই মিলনে বিচ্ছিন্নতা এসেছে (আদি ৩:১৪-২৩)। অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে মানুষ এদেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছে; মানুষের জীবনে পাপ নেমে এসেছে। এক ভাই আর এক ভাইকে হত্যার ফলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কলুষিত হয়েছে। ফলে সৃষ্ট ভূমি হয়েছে রক্তসিক্ত ও অভিশপ্ত।

যুগ যুগ ধরে ভোগ-বিলাসিতা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপর মনোভাবের জন্য মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহ লেগেই আছে। ধর্মের অপব্যবহার ও জাতিগত দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্তমান যুগের নিত্য ঘটনা। ফলে ঝরে যাচ্ছে অগণিত তাজা প্রাণ, ধরিত্রী আর সমগ্র বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন। অথচ শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতির আজ কোনো বিশ্রাম নেই। বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের উপর অসহনীয় হস্ত ক্ষেপ। ভূমি, জল, বায়ু প্রতিনিয়ত শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। এগুলোর অপব্যবহার ও অবৈধ নিয়ন্ত্রণের ফলে দূষিত হচ্ছে প্রকৃতি। পরিবেশ হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। দূষিত হচ্ছে আবহাওয়া। পরিবর্তিত হচ্ছে বিশ্বের জলবায়ু ও আবহাওয়া। উত্তপ্ত হচ্ছে বিশ্ব, উষ্ণ আবহাওয়া হচ্ছে অসহনীয়। ফলে প্রকৃতিতে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। শীতের সময় তাপমাত্রা সহনীয় মাত্রার থেকে অতি নিম্নে আবার গরমের সময় অতি ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে।

নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বন হয়ে যাচ্ছে পশু-পাখির বসবাসের অযোগ্য। নদ-নদী ভরাট ও নদীতে বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপে মাছ ও জলজ প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। আণবিক বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস দুষিত করছে বাতাস। ফলে বাতাস ভারী হয়ে আসছে। এর ফলে প্রতিনিয়ত আসছে প্রলয় ও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মানুষের উপর নেমে আসছে প্রাকৃতিক দুর্দশা ও শাস্তি । মানুষ পতিত হচ্ছে মৃত্যুমুখে।

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড বেড়ে গিয়েছে। ফলে বিগত কয়েক বছরে চীন ও পাকিস্ত ানে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমি-ধস হয়েছে, রাশিয়ায় খরা হয়েছে, ব্রাজিলে দাবানল হয়েছে, জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প ও সুনামি হয়েছে। এসব প্রাকৃতিক বৈরিতা কেড়ে নিয়েছে অগণিত মানুষের প্রাণ।

পরিবেশবাদীদের মতে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্র গভীরে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, অসময়ে খরা, অসময়ে বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঝড় ও জ্বলোচ্ছাস বৃদ্ধি, ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমিধস ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। পুষ্টিহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক বৈরিতা ও দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেনিয়ার ওয়ানগারির কথাটিতে আমরা আবার ফিরে যেতে পারি, "ঈশ্বর যদি মানুষকে প্রথম দিনই সৃষ্টি করতেন, তবে অন্যান্য সৃষ্টির সেবা-যত্ন না পেয়ে মানুষ পরের দিনই মরে যেত।" সৃষ্টিকে যত্ন নেওয়া মানুষের একটি দায়িত্ব। কারণ সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নেওয়ার জন্যই সৃষ্ট। সৃষ্টির সেই সেবা পাওয়ার কারণেই মানুষকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা রাখা এবং যত্ন করা প্রয়োজন।

কাজ : ঈশ্বরের সৃষ্টিকে তুমি কীভাবে যত্ন করতে পার, তার ৫টি করে উপায় লেখ।

পাঠ ৩ : পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা

পরিবেশ দূষণের ফলে ঈশ্বরের অপরূপ সৃষ্টি প্রতিনিয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তমতাকে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে, টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আর এই কাজটি করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। সৃষ্টিকে যত্ন ও সংরক্ষণ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে হবে। এর কয়েকটি উপায় আমরা নিজেরাও খুঁজে পেতে পারি। সৃষ্টিকে যত্ন ও রক্ষা করার কয়েকটি উপায় নিম্নে বর্ণনা কর হলো।

১। প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল শক্তি। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষ আজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অনেক নতুন নতুন বিষয় মানুষ আবিষ্কার করছে। কিন্তু গভীরভাবে বিশেষণ করলে দেখা যাবে এই উদ্ভাবনের পিছনে প্রকৃতিই মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। প্রকৃতিই মানুষকে তথ্য-উপাত্ত যুগিয়েছে। প্রকৃতিই মানুষকে জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছে। প্রকৃতি থেকে জ্ঞান নিয়েই মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পেরেছে। মানুষের এই জ্ঞান প্রকৃতিরই জ্ঞান। মানুষ যখন এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তারা প্রকৃতিকে ভালোবাসতে ও রক্ষা করতে শিখবে।

২। শিল্পায়নের ফলে প্রকৃতির বিশ্রাম নেই। শিল্পায়নের ফলে সবচেয়ে বেশি শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে প্রকৃতি। শিল্পায়নের জন্য সমস্ত কাঁচামাল যোগান দিতে হচ্ছে প্রকৃতি থেকেই। ফলে ভূমি, জল ও বায়ু দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ হচ্ছে অপরিচ্ছন্ন ও দূষিত। আবহাওয়া হচ্ছে উত্তপ্ত ও অসহনীয়। এই বাস্ত বতা যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে তখনই সৃষ্টির প্রতি যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে।

৩। বর্তমান বাস্ত বতায় মানুষ স্বার্থপর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা যে কোনো মন্দ কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। অন্যের ক্ষতি হচ্ছে, সম্মান হানি হচ্ছে সেদিকে তাকাবার সময় মানুষের নেই। জায়গা-জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চলছে। নিরীহ মানুষ বিভিন্নভাবে হয়রানি হচ্ছে। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজি ও খুন-খারাবি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ছোট পরিবার আরও ছোট হচ্ছে। আবার ছোট পরিবারও ভেঙে মানুষ একাকী জীবন যাপন করছে। পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ-মায়া, দরদ ও ভালোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও পরিবারে পারস্পরিক ন্যায্যতা, মর্যাদা, আস্থা, দয়া ও ভালোবাসা ফিরিয়ে আনতে হবে। ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঠিক ব্যবহার করতে হবে। তবেই সৃষ্টির সৌন্দর্য সুন্দরতর হয়ে উঠবে।

৪। প্রকৃতি-নির্ভর দরিদ্রদের সাহায্যের মনোভাব বৃদ্ধি করতে হবে। পৃথিবীতে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। প্রকৃতি থেকেই তারা খাদ্য আহরণ করে। প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই কৃষিকাজ করে। আবার এই প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করে। ব্যক্তি স্বার্থে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। দখল হয়ে যাচ্ছে তাদের শেষ সম্বলটুকু। বিতাড়িত হচ্ছে তারা প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিও আর আপন গতিতে নেই। জলবায়ু, আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে এসমস্ত প্রকৃতি নির্ভর দরিদ্র জনগণ বঞ্চিত ও অবহেলিত হচ্ছে। তাদের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। সবার জন্য সুষম ও যথেষ্ট খাদ্য নিশ্চয়তা দিতে হবে। বনায়ন, বৃক্ষরোপণ, পতিত জমি চাষাবাদ, আবাদি জমির উপর আবাসন তৈরি না করে তা সংরক্ষণ করা, দেশীয় গাছ রোপণ, বন ও পাহাড় পর্বত সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ ও পশুপালন করতে হবে।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ রক্ষা, ন্যায্যতা ও নৈতিকতা বিষয়ে সকল স্ত রের মানুষের মাঝে জাগরণ ঘটাতে হবে। এর জন্য সচেতনতামূলক শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। পাঠ্যপুস্ত ক ব্যতীতও বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মাঝে গণ-চেতনা জাগাতে হবে। প্রাণের অধিকার, শিশুর যত্ন ও শিক্ষা, প্রকৃতির যত্ন, পানির অপচয় রোধ, নদী

খনন, বর্জ্য নিঃসরণ আইন, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার, বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা জোরালো করতে হবে। দূষণ পরিশোধনের উপায় জানতে হবে এবং সবাইকে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

কাজ ১ : পরিবেশ সংরক্ষণে তুমি তোমার এলাকায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার তা লেখ।

কাজ ২ : পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে মানুষকে কীভাবে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া যায় তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা কর এবং পরে কয়েকজন উপস্থাপন কর।

পাঠ ৪ : সৃষ্টিকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসা

আমরা পূর্বেই জেনেছি সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের সকল মুক্তি পরিকল্পনার উৎস বা ভিত্তি। "আদিতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন।" (আদি ১:১)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা। তিনি মহাবিশ্বের সব কিছুর পূর্ণতা দিয়েছেন।

গাছ লাগানো সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার চিহ্ন

শেষে "পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাঁকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।" তিনি দেখলেন, সমস্ত সৃষ্টিই অতি উত্তম। মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের মাঝে নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। ফলে একমাত্র মানুষই সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও ভালোবাসতে পারে।

ঈশ্বরের সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে মূলত ঈশ্বর তার ভালোবাসাকেই মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। কারণ তিনি ভালোবাসার উৎস। তিনিই প্রকৃত ভালোবাসা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ভালোবাসতে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারব।

সৃষ্টির যত্ন ও তার উপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে মানুষকে অবশ্যই সর্বপ্রথম তার নিজের উত্তমতা ও সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে হবে। নতুবা সে সৃষ্টিকে উত্তমতার পথে পরিচালিত ও যত্ন করতে পারবে না। সৃষ্টিকে যত্ন করার দায়িত্ব একটি ভালোবাসার দায়িত্ব, দাসত্বের উদ্দেশ্যে নয়। ভোগ বা ধ্বংস করার জন্য নয়। মানুষ সৃষ্টির যত্ন নিবে; সৃষ্টিও মানুষের যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সৃষ্টির সেবা পাওয়ার কারণেও মানুষকে সৃষ্ট সমস্ত কিছুর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং যত্ন করা প্রয়োজন।

মোশীর কাছে ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য থেকে যেমন বলেছিলেন, "তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল, কেননা যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র ভূমি।" (যাত্রা ৩:৫)। সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারেই ঈশ্বরের এই কথা খাটে। সেই মন নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে বিচরণ করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন নেওয়া ও মানুষকে ভালোবাসা প্রয়োজন। সৃষ্টিকে যত্ন করার ও মানুষকে সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা ও ভালোবাসা প্রকাশ পাবে। সৃষ্টির উত্তমতাও রক্ষা পাবে।

কাজ : "সৃষ্টির যত্নে নয়, উপাসনার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়"– এই বিষয়ের উপর একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ভালোবেসে ঈশ্বর ... নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষকে।

২. ঈশ্বর ... বিশ্রাম নিয়েছেন।

৩. ব্যক্তিস্বার্থে ... নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

৪. ... ভালোবাসার উৎস।

৫. আদিতে ... আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর মহাবিশ্বের সব কিছু	• আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র কর্তব্য
২. ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিকে লালন করা	• পূর্ণতা দিয়েছেন
৩. তাঁর সমকক্ষ আর	• বাংলাদেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
৪. নিজের স্বার্থে সৃষ্টির	• কেউ নেই
৫. প্রাকৃতিক বৈরিতা ও দুর্যোগের ফলে	• অপব্যবহার করছি
	• হারিয়ে যাচ্ছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পরিবেশ দূষিত হওয়ার জন্য প্রধানত দায়ী কারা?

ক. প্রকৃতি　　খ. মানুষ

গ. ব্যবসায়ী　　ঘ. ধনী দেশগুলো

২. কেন ঈশ্বর মানুষকে সর্বশেষে সৃষ্টি করেছেন?

ক. মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে　　খ. যেন সুন্দর পৃথিবী পায়

গ. মানুষের ভালোবাসার জন্য　　ঘ. ঈশ্বরের গৌরবের জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রীমা ফুলের বাগান করতে ও হাঁস-মুরগি পালন করতে পছন্দ করে। তাই সে প্রতিদিন ফুলের বাগানে পানি দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে এবং হাঁস-মুরগিকে বার বার খাবার দেয়। রীমা ফুল ও হাঁস-মুরগি বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে।

৩. রীমার কাজের মাধ্যমে কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা

খ. সৃষ্টির প্রতি প্রভুত্ব

গ. সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব

ঘ. নিজের আধিপত্য বিস্ত ার

৪. উদ্দীপকে প্রকাশ পায়–

ক. সৃষ্টির উত্তমতা

খ. ঈশ্বরের ভালোবাসা

গ. সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্ণব খাল ভরাট করে তার বসত বাড়ি তৈরি করেছে। গাছ কেটে ঘরের অনেক আসবাবপত্র তৈরি করে ঘরকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। কিন্তু বাড়ির চারপাশে সে বিভিন্ন প্লাস্টিক, পলিথিন ও রান্নাঘরের যাবতীয় ময়লা ফেলে খারাপ অবস্থা করেছে। সে পাখির মাংস খেতে পছন্দ করে তাই সে প্রায়ই পাখি শিকার করে। মাঝে মধ্যে সে পশুও শিকার করে। গাছ ও চামড়া বিক্রি করে অর্থও উপার্জন করে।

ক. সকল সৃষ্টির যত্ন নেওয়া কার দায়িত্ব?

খ. সৃষ্টির সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার কারণ কী?

গ. অর্ণবের কাজের মাধ্যমে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অর্ণব তার কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করবে বলে তুমি মনে কর– পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে তোমার মতামত দাও।

২. জন ও জেনি গাজীপুরের 'প্রার্থনা কুঞ্জে' একটা সেমিনারে গেল। সেখানে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ দেখে তারা অবাক হয়ে বলল, 'বাহ্ কী সুন্দর পরিবেশ।' প্রার্থনা কুঞ্জের চারদিকে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ সারিবদ্ধভাবে রয়েছে। রয়েছে ফুলের বাগানও। পুরোহিত বললেন, 'এ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি।' তারা বাড়ি ফিরে গেল। তারা একটা 'সংঘ' গঠন করল। সংঘের মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য, অসুস্থদের সেবা, বয়স্ক শিক্ষা, ফুল ও ফলের গাছ লাগানো ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করে। তাদের উদ্যোগে গ্রামে গাছ কাটা, পাখি শিকার করা ইত্যাদি কাজ বন্ধ হয়। গ্রামের সকলেই তাদের এ কাজে খুব খুশি।

ক. প্রকৃত ভালোবাসার উৎস কে?

খ. কীভাবে সৃষ্টির উত্তমতা হারিয়ে যাচ্ছে?

গ. ঈশ্বরের দেওয়া কী দায়িত্ব জন ও জেনি পালন করে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জন ও জেনি কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসে ও যত্ন করে– উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মানুষ কেন সকল সৃষ্টির যত্ন নিবে?

২. সৃষ্টির সৌন্দর্য কীভাবে কলুষিত হচ্ছে?

৩. আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারব?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কী উপায়ে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে লালন পালন ও সংরক্ষণ করা যায়?

২. সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও যত্ন করার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও যত্ন করা যায়– ব্যাখ্যা কর।

৩. ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মকে কীভাবে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর ও মানুষ

আদিপুস্ত কে বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর একের পর এক সবকিছু সৃষ্টি করলেন। প্রতি দিনই তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন তা উত্তম হয়েছে। পঞ্চম দিনে তিনি বললেন,"এবার মানুষকে গড়ে তোলা যাক আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদেরই সাদৃশ্যে।" তিনি তাই করলেন। এভাবে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্ট হলো। সকল কিছুর উপর প্রভুত্ব করার দায়িত্ব তিনি মানুষকে দিলেন।

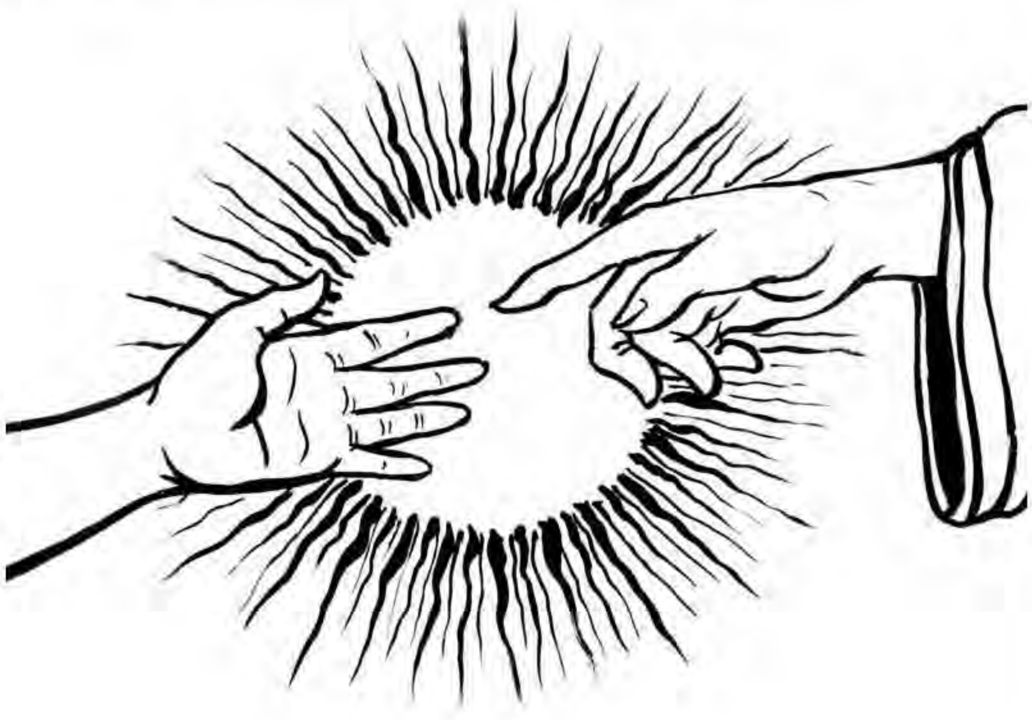

ঈশ্বর ও মানুষের মিলন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- মানুষ ঈশ্বরের সহকর্মী-- এই ধারণাটি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও সম্পর্কের ফল বর্ণনা করতে পারব;
- ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরের সহকর্মী মানুষ

মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও ভালোবাসার প্রকাশ। মানুষ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের একটি মহৎ পরিকল্পনা ছিল। মানুষের সাথে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন নিবিড় সম্পর্ক। তার মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছেন তাঁর আত্মপ্রকাশ। মানুষকে তিনি দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা। মানুষ সৃষ্টির পর ঈশ্বর মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর! তোমরা পৃথিবীকে ভরিয়ে তোল, তাকে বশীভূত কর। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে যত প্রাণী, তাদের সকলের উপর তোমরা প্রভুত্ব কর" (আদি: ১:২৮)। এই আশিস-বাণীর মধ্যেই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। আমরা আগে জেনেছি যে, ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব কীর্তন করার জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু শুধু তাই নয়। তিনি মানুষের উপর দিয়েছেন সৃষ্টির সমস্ত দায়িত্বভার। তিনি মানুষকে দিয়েছেন তাঁর সহকর্মী হবার অধিকার। মানুষ ঈশ্বরের সহকর্মী। আমরা এবার জানব মানুষ কেন ও কীভাবে ঈশ্বরের সহকর্মী হতে পারে। অর্থাৎ সহকর্মী হয়ে ওঠার অর্থ কী :

১। ঈশ্বরের সহকর্মী হওয়া মানুষের জন্য একটি আহ্বান। ঈশ্বরের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তার সহকর্মী দরকার। যুগে যুগে তাই মানুষকে তিনি ডাকেন। তাই আমরা বলতে পারি সহকর্মী হয়ে ওঠার অর্থ হলো ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়া। বালক সামুয়েলকে ঈশ্বর যখন ডেকেছিলেন তখন এলি তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, এভাবে উত্তর দিতে : "বলুন প্রভু আপনার দাস শুনছে।" যুগে যুগে ঈশ্বরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি বিভিন্ন মানুষকে বা প্রবক্তাদের ডেকেছেন। যাঁরা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন। ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেছেন। আজও তিনি আমাদের এভাবে ডাকেন তাঁর কাজের জন্য।

২। সহকর্মী হওয়ার অর্থ নেতৃত্ব দান করা বা পরিচালনা করা। অদৃশ্য ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজের প্রতিমূর্তিতে। মানুষকে তিনি দিয়েছেন অসাধারণ গুণ, বুদ্ধি ও ক্ষমতা। ঈশ্বরের দেওয়া এই সকল গুণ ও বুদ্ধি ব্যবহার করে মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি পরিচালনা করছে। বিশ্বের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ যোগ্য পরিচালনার মাধ্যমে নিজ নিজ জাতির মানুষকে সঠিক নির্দেশনা দিচ্ছে।

৩। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন। কিন্তু ঈশ্বর অদৃশ্য। মানুষের মধ্য দিয়ে, মানুষের পারস্পরিক সেবা ও ভালোবাসার মধ্যে ঈশ্বর নিজেকে ও তাঁর ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে চান। তাই আমরা বলতে পারি নিজের কিছু কিছু গুণ ঈশ্বর মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। মানুষ ঈশ্বরের সেই গুণ ব্যবহার করে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।

৪। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি জীবনদাতা, পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। কিন্তু ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষকে ব্যবহার করার মাধ্যমে তাঁর যত্ন ও প্রতিপালনের কাজ করে থাকেন। যেমন ডাক্তারগণ মানুষের নানারকম জটিল রোগের চিকিৎসা করে থাকেন। ডাক্তারের সাহায্যে ঈশ্বর নিরাময়তার কাজ করছেন। পিতামাতার মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীতে নতুন জীবন দান করেন। এভাবে তাঁরা হয়ে উঠছেন ঈশ্বরের সহকর্মী।

৫। যীশু নিজেই বলেছেন আমি তোমাদের আর দাস বলছি না বরং বন্ধু বলছি। বন্ধুর জন্য প্রাণ দেবার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নাই। এর থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি আমরা ঈশ্বরের বন্ধু হতে আহূত। আর বন্ধু হিসাবেই তিনি সবকিছু আমাদের সাথে সহভাগিতা করেন। পুরাতন নিয়মে আব্রাহামকে বলা হয় "ঈশ্বরের বন্ধু"।

৬। আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করে তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দান অর্থাৎ স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ তার স্বাধীনতা ব্যবহার করে ঈশ্বরের কাজে নিজেকে উদারভাবে বিলিয়ে দেয়। নিজের জীবন দিয়ে স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের মাধ্যমেই মানুষ সবচেয়ে বড় সহকর্মী হয়ে ওঠে।

কাজ : তুমি কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের সহকর্মী হিসেবে দেখ, তার তিনটি দিক দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ২ : এদেন উদ্যানে ঈশ্বর ও মানুষের সুসম্পর্ক

ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। সে সময় পৃথিবীর জমিতে কোনো গাছপালা বা ঝোপঝাড় কিছুই ছিল না। তখন ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন। মাটি ভিজিয়ে রাখার জন্য একটি জলধারা নামিয়ে আনলেন। কিন্তু জমিতে চাষাবাদ করার জন্য কোনো মানুষ তখনো ছিল না। ঈশ্বর মাটি থেকে একমুঠো ধুলো তুলে নিলেন। তা থেকে তিনি গড়ে তুললেন একজন মানুষ। তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তখন মানুষ হয়ে উঠল এক সজীব প্রাণী। তিনি তার নাম রাখলেন আদম অর্থাৎ মানুষ।

মানুষকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর তাঁদের পরম সুন্দর ও সুখের স্থানে রাখলেন। এই জায়গাটির নাম হলো এদেন বাগান। মানুষের আনন্দ ও সুখের জন্য তিনি সব কিছু তৈরি করলেন। তাঁর সমস্ত কিছু ভোগ করার অধিকারও দিলেন। এখানকার সব গাছপালা খুবই চমৎকার। ফলগুলোও ছিল খুব সুমিষ্ট। বাগানের মাঝখানে তখন বেড়ে উঠল ভালোমন্দ জ্ঞানের বৃক্ষ।

মানুষকে ঈশ্বর এই বাগানের অধিকারী করে তুললেন। তিনি চাইলেন মানুষ যেন এদেন বাগানের দেখাশুনা করে। তিনি তাঁকে ভালোমন্দ জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল খেতে বারণ করেছিলেন। তারপর একসময় ঈশ্বর দেখলেন আদম বড় একাকী। ঈশ্বর বললেন : "মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তাই আমি এখন তার জন্য এমনই একজনকে গড়ে তুলব, যে তাকে সাহায্য করবে, তার যোগ্য সঙ্গী হবে।" তারপর প্রভু ঈশ্বর মানুষের উপর নামিয়ে আনলেন এক তন্দ্রার আবেশ। একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার বুক থেকে একটি পাঁজর খুলে নিয়ে তিনি গড়ে তুললেন একজন নারীকে। সে হয়ে উঠল মানুষের যোগ্য সঙ্গী। মানুষ অর্থাৎ আদম বুঝতে পারলেন যে তার সঙ্গে হবার দেহমনের আত্মীয়তা রয়েছে। তারা দুইজনেই সমানভাবে মানব সত্তার অধিকারী। তারা দুইজনেই বুঝতে পারলেন যে তারা সমানভাবে একে অন্যের পরিপূরক কিন্তু একইভাবে নয়। আর তাই তারা মিলিত জীবনের দিকে প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। কী অপার সুখে ঈশ্বরের নিবিড় সান্নিধ্যে ও পরস্পরের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ স্বর্গে বাস করছিল। তারা উলঙ্গ ছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল না কোনো লজ্জাবোধ। পরস্পরের সাথে এরূপ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

কাজ : এদেন বাগানে ঈশ্বরের সাথে আদম ও হবার সম্পর্ক নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

পাঠ ৩ : সম্পর্ক ভঙ্গ

এদেন বাগানে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মহাসুখে বাস করছিল। ঈশ্বরের সাথে মানুষের এই সুসম্পর্ক শয়তান কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না। এই সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য শয়তান সুযোগ খুঁজতে লাগল। স্থলভূমিতে সবচেয়ে চালাক প্রাণী হলো সাপ। শয়তান একদিন সাপের বেশে এসে নারীকে বলল, ঈশ্বর কি সত্যিই এই কথা বলেছেন : এই বাগানের কোনো গাছের ফল তুমি খাবে না?" নারী সাপকে উত্তর দিল : আমরা এই বাগানের যে কোনো গাছের ফল খেতে পারি; শুধুমাত্র যে গাছটি বাগানের মাঝখানে রয়েছে, সেটির সম্পর্কে ঈশ্বর বলেছেন, "তোমরা তা খাবেও না ছোঁবেও না! যদি তা খাও তাহলে তোমরা মরবেই মরবে।"

তখন সাপ নারীকে বলল : কক্ষনো না, তোমরা মরবেই না। ঈশ্বর তো ভালোভাবেই জানেন, যেদিন তোমরা ওই ফল খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ যেন খুলেই যাবে, তোমরা দেবতার মতোই হয়ে উঠবে : ভালোমন্দ জানতেই পারবে তোমরা! তখন নারী দেখল, ওই গাছের ফল খাদ্য হিসেবে ভালোই আর তা দেখতেও ভারি সুন্দর। তাছাড়া বোধবুদ্ধি পাবার ব্যাপারে তার তো একটা আকর্ষণও রয়েছে। তাই সে গাছ থেকে ফল পেড়ে নিজে খেল ও তার স্বামীকেও দিল। তখন তাদের দুইজনেরই চোখ খুলে গেল। তারা বুঝতে পারল তারা উলঙ্গ। আঙ্গীর গাছের পাতা একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে তারা নিজেদের জন্য আবরণ তৈরি করল। বুঝতে পারল, তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে।

ঈশ্বরের পায়ের শব্দ শুনে তারা ভয় পেল। তারা ঈশ্বরকে দেখে লুকিয়ে পড়ল। তাদের মনের নির্মল নিষ্পাপ পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। এতদিন ঈশ্বরের সাথে তাদের অতি সহজ, স্বাভাবিক ও সুখময় সম্পর্ক ছিল। এখন কিন্তু তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য আর সহ্য করতেই পারছিল না। ঈশ্বরকে তারা লজ্জা পেতে শুরু করল। তাদের মধ্যে তীব্র অপরাধ বোধ শুরু হলো। পাপের শাস্তি হলো– মানুষের পতন হলো। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক নষ্ট হলো। আদম তার পাপের জন্য হবাকে দোষারোপ করল আর হবা দোষারোপ করল সাপকে। ঈশ্বর সাপকে ও নরনারীকে শাস্তি দিলেন। মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে এলো। স্বর্গসুখ ও স্বর্গের দরজা মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

কাজ : আদি পুস্তক ৩ অধ্যায় পাঠ করে মানুষের পতনের ঘটনাটি অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ৪ : সম্পর্ক পুনঃস্থাপন

ঈশ্বর মানুষকে এত ভালোবাসলেও মানুষ বারংবার তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে। পৃথিবীতে এসে মানুষ পাপের জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু তিনি মানুষকে রক্ষা করতে চান। মানুষের পাপের কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করার জন্য তিনি বারংবার উদ্যেগ নিলেন। মানব ইতিহাসে তিনি প্রবেশ করলেন। পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বর যে উদ্যোগ নিয়েছেন এবার আমরা সে বিষয়গুলো জানব।

আমরা আগেই জেনেছি যে মানুষ অবাধ্য হয়ে পাপ করলেও ঈশ্বর মানুষকে একেবারে ত্যাগ করেননি। তাকে তিনি পাপ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠাবার কথা বললেন। তাঁর পুত্রকে মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠাবার জন্য তিনি একটি জাতিকে মনোনীত করলেন। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হলো ইস্রায়েল জাতি। ইস্রায়েল জাতির বিভিন্ন ব্যক্তি, রাজা, প্রবক্তাকে তিনি বেছে নিলেন তাঁর প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য।

অব্রাহামকে তিনি করলেন মনোনীত জাতির পিতা, বিশ্বাসীদের পিতা। তিনি তাঁর সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করলেন। তিনি বললেন, "আমি এখন আমার ও তোমার মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপন করছি; তোমার বংশধরদের সংখ্যা আমি সুবিপুল করে তুলব।"

পৃথিবী যখন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি জলপাবন দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু তিনি নোয়ার মধ্য দিয়ে মানবজাতির সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। তখন তিনি আকাশে একটি রঙধনু স্থাপন করেছিলেন এই সন্ধির প্রতীক হিসেবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মানুষকে তিনি আর এভাবে ধ্বংস করবেন না।

মোশীকে ঈশ্বর আহ্বান করেছিলেন মিশর দেশের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করার জন্য। মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। মিশর দেশ থেকে কানান দেশে যাত্রাকালে ইস্রায়েল জাতি বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে। ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বর বার বার বলেছেন, তোমারা আমার আপন জাতি আর আমি তোমাদের আপন ঈশ্বর।

তারপর তিনি রাজা ও প্রবক্তাদের বেছে নিলেন। রাজা দাউদকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। পরে এই বংশে তাঁর পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন। প্রবক্তা ইসাইয়া মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী ঘোষণা করেছেন। সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের চূড়ান্ত পর্যায় হলো ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্টের মানব হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ। রাজা দাউদের বংশধর হয়ে একজন নারীর গর্ভে যীশু মানুষরূপে জন্ম নিলেন। মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে তিনি ক্রুশ মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন। মৃত্যুকে জয় করে তিনি শয়তানের কবল থেকে মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করলেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বর্গের দরজা আবার খুলে দিলেন। তিনিই মশীহ। তিনি হলেন প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। তাঁর মধ্য দিয়েই পূর্ণ হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা। ঈশ্বর ও মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক আবার স্থাপিত হলো। যীশু হলেন নতুন আদম। এই সুসম্পর্ক রক্ষার্থে যীশু স্থাপন করলেন মণ্ডলী ও পুণ্য সংস্ক ারসমূহ। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা আদি পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং মণ্ডলীতে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি। পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার যোগ্য হয়ে উঠি।

ইতিহাসের প্রভু এইভাবে অসীম ক্ষমা ও ভালোবাসায় মানুষকে রক্ষা করলেন। মানুষের অবিশ্বস্ত তা সত্ত্বেও তিনি নিজ উদ্যোগে মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন।

পাঠ ৫ : ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপায়

আমরা সবাই শান্তি চাই, সর্বদা আনন্দে থাকতে চাই। আমরা সঙ্গী চাই, বন্ধু চাই। ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এরকমই একটি সহজাত প্রবণতা দিয়েছেন। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে কারো না কারো সাথে সম্পর্কিত হতে চাই। এমনকি একটি ছোট্ট শিশুও তার মতো আর একজন শিশুকে পেলে খুব খুশি হয়। কেউ আমাদের ভালোবাসলে বা আমরা কাউকে ভালোবাসতে পারলে খুব আনন্দ পাই। ঈশ্বরও আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্যে প্রথমে উদ্যোগ নিয়েছেন। ঈশ্বরপুত্র যীশু আমাদের সাথে এক হবার জন্যে মানুষরূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কীভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যায় এবার আমরা সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

১। **যোগাযোগ :** সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। যোগাযোগ নানাভাবে হতে পারে। সরাসরি দেখা সাক্ষাৎ করে, কথা বলে, নানা রকম মাধ্যম ব্যবহার করে– যেমন, চিঠিপত্র, ইমেইল, ফোন করার মাধ্যমে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি।

২। **মানব সেবা :** মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে আমরা সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক রচনা করতে পারি মানুষের সেবা করে বা মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু করার মাধ্যমে। কারণ যে মানুষকে আমরা চোখে দেখতে পাই তাকে ভালো না বেসে আমরা কখনোই অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি না।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এক মানুষ আর এক মানুষকে সাহায্য করে

৩। **উপাসনা :** নিয়মিত ধ্যান, প্রার্থনা, উপাসনায় অংশগ্রহণ, বাইবেল পাঠ এবং সবকিছুতে ঈশ্বরের মঙ্গলময় উপস্থিতি অনুভব করে আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক থাকলে মানুষের সাথেও আমাদের সম্পর্ক ভালো হবে। আবার মানুষের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে ঈশ্বরের সাথেও সম্পর্ক ভালো থাকবে।

৪। **আস্থা ও বিশ্বাস :** পারস্পরিক আস্থা সুসম্পর্ক রক্ষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যখন কারো উপর আস্থা স্থাপন করি এবং কেউ যখন আমাদের উপর আস্থা রাখে তখন খুব সহজেই আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ঈশ্বরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়।

৫। **সততা :** সুসম্পর্কের ভিত্তি হলো সততা। সম্পর্কের আদান প্রদান ও ভাববিনিময়ে আমরা যখন সৎ থাকি তখন সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। ছলচাতুরী বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কখনো সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না।

৬। **গ্রহণ :** আমরা দোষগুণ মিলিয়ে মানুষ। আমরা যখন কাউকে গ্রহণ করি এবং কেউ যখন আমাদের গ্রহণ করে তখন আমরা খুব আনন্দ পাই। পারস্পরিক গ্রহণীয়তার মধ্য দিয়ে আমারা একে অন্যের আপনজন হয়ে উঠি। মানুষ মনে প্রাণে গ্রহণীয়তা কামনা করে। ঈশ্বর সব অবস্থায় আমাদের গ্রহণ করেন বলেই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি।

৭। **শ্রদ্ধা :** পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়ে আমরা সুসম্পর্ক গড়ে তুলি। মতামত প্রকাশের সুযোগ দান, কথায় গুরুত্ব দেওয়া, বিভিন্ন অবস্থার সময় সমর্থন প্রদান করে আমরা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারি। প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন বা আলাদা, একক ও অনন্য। মানুষের এ ভিন্নতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীলতা সম্পর্ক গঠনে বিশেষ সহায়ক। ঈশ্বর আমাদের সবার স্বাধীন ইচ্ছাকে মর্যাদা দেন।

৮। **সমঝোতা :** পরস্পরকে বোঝার মাধ্যমে একে অপরকে গ্রহণ করা, কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমঝোতায় আসতে পারি। এতে করে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। ঈশ্বর আমাদের সব অবস্থা বোঝেন।

৯। **সাহায্য সহযোগিতা:** জীবনের বিশেষ অবস্থা ও সময়ে বিশেষ করে দুর্দিনে বা বিপদের সময় সাহায্য সহযোগিতা করলে ও পেলে আমরা শক্তি ও সাহস পাই। আনন্দ ও উৎসবের দিনেও আমরা উপস্থিত হয়ে নিজেরা খুশি হই এবং অন্যদেরও খুশি করি। এতে করেও আমাদের সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়। ঈশ্বর সব অবস্থায় আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন বলেই আমরা তাঁর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

১০। **সাম্য বা সমান মর্যাদা :** ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব ভেদাভেদ না করে সবাইকে সমান মর্যাদা দান করলেও সম্পর্ক গভীর হয়। ঈশ্বরের চোখে আমরা সবাই সমান।

এভাবে মানুষ মানুষকে ভালোবেসে ও সম্পর্ক রক্ষা করে ঈশ্বরের সাথেও সুসম্পর্ক স্থাপন ও তা বজায় রাখতে পারে।

কাজ : তোমাদের শ্রেণিকক্ষে কীভাবে বা কী কী উপায়ে তোমরা সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পার তা আলোচনা করে একটি পোস্টার তৈরি কর ও সেটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ... পাপের ক্ষমা লাভ করি।

২. সকল কিছুর উপর ... করার দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষকে দিলেন।

৩. ঈশ্বরের নিবিড় সান্নিধ্য ও পরস্পরের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ... বাস করছিল।

৪. মানুষ স্বর্গ থেকে ... হয়ে পৃথিবীতে এলো।

৫. সুসম্পর্কের ভিত্তি হলো ... ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মানুষের সাথে ঈশ্বর গড়ে তুলতে চেয়েছেন	• সৃষ্টির সমস্ত দায়িত্বভার
২. মানুষ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের	• নিবিড় সম্পর্ক
৩. ঈশ্বর মানুষের উপর দিয়েছেন	• একটি মহৎ পরিকল্পনা ছিল
৪. ডাক্তারের সাহায্যে ঈশ্বর	• পৃথিবীতে এলো
৫. মানুষ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে	• নিরাময়তার কাজ করছেন
	• কর্তৃত্ব করার অধিকার

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুরাতন নিয়মে কাকে 'ঈশ্বরের বন্ধু' বলা হয়েছে?

ক. মোশীকে খ. আব্রাহামকে
গ. দানিয়েলকে ঘ. এলিয়কে

২. মানুষকে ঈশ্বর এদেন বাগানের অধিকারী করে তুললেন কেন?

ক. কর্তৃত্ব করার জন্য খ. পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য
গ. মানুষের আনন্দ ও সুখের জন্য ঘ. মানুষের পবিত্রতা রক্ষার্থে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

জয় বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মা তাকে পড়তে বসতে বললে সে তা না করে সারাক্ষণ কম্পিউটারে গেম খেলে সময় নষ্ট করে। সন্ধ্যায় ঘরে প্রার্থনার সময় সে অনুপস্থিত থাকে। রবিবার দিন গির্জায় যায় না, নিজের ইচ্ছেমতো কাজকর্ম করে।

৩. মানুষের এরূপ অবস্থা থেকে ফেরানোর জন্য ঈশ্বর কাকে প্রেরণ করেছিলেন?

ক. মোশীকে খ. এলিয়কে
গ. যীশুকে ঘ. যোহনকে

৪. জয়ের এরূপ আচরণের ফল হতে পারে–

i. ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের অবনতি
ii. স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত
iii. পরিবারে অশান্তি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিখিল লোভী প্রকৃতির মানুষ। গ্রামের মানুষের জমিজমা দখল করে সে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছে। গ্রামে সে বিশাল অট্টালিকা তৈরি করেছে এবং অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র দিয়ে ঘর সাজিয়েছে। বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিপদে পড়ে কেউ তার কাছে সাহায্য চাইলে কখনো কাউকে সাহায্য করেনি। গির্জার ফাদার তাকে এ পথ থেকে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, 'ঈশ্বর যুগে যুগে তোমার মতো মানুষকে ফেরানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।'

ক. সুসম্পর্কের ভিত্তি কী?

খ. সহকর্মী বলতে কী বুঝ?

গ. নিখিলের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী ধরনের? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নিখিলের প্রতি ফাদারের উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. মি. যেরম প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে দরিদ্র, দক্ষ, কর্মঠ কর্মচারী নিয়োগ করেন। সকল কর্মচারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের দেওয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য আগ্রহ ও দক্ষতার সাথে পালন করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতি করতে থাকে। এতে মি. যেরম খুবই সন্তু ষ্ট হলেন এবং কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকেও যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আর্থিকভাবে দুর্বলদের আর্থিক সাহায্য দান করেন এবং বিভিন্নভাবে ঋণ দানের ব্যবস্থা করে দেন।

ক. কার প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি হলো?

খ. ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হলো কেন?

গ. মি. যেরমের কাজের জন্য তাকে ঈশ্বরের কী বলা যায়?

ঘ. 'মি. যেরমের কাজ ছাড়াও আরও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব'– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঈশ্বর কেন আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন?

২. সহকর্মী বলতে কী বোঝায়?

৩. যীশু কেন মণ্ডলী ও পুণ্য সংস্কারসমূহ স্থাপন করলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের সহকর্মী হতে পারে?

২. ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৩. এদেন বাগানে ঈশ্বরের সাথে আদম ও হবার সম্পর্ক নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মানুষের পতনের ফল

স্বর্গদূতদের পতন, পতনের ফল, বিভিন্ন রকমের পাপ ও পাপের ফল সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই জ্ঞান লাভ করেছি। মানুষের অর্থাৎ আমাদের আদি পিতা-মাতার পাপের কথা জানার মধ্য দিয়ে আমরা আদিপাপের বিষয়েও জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা মানুষের পতনের ফল নিয়ে একটু গভীর আলোচনা করব। আমরা জানি, মানুষ পাপ করে শাস্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করে ফেলেননি বা পরিত্যাগও করেননি। তাকে এখন থাকতে হচ্ছে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য তার মধ্যে রয়েছে গভীর আকাঙ্ক্ষা। একদিকে পাপের প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ আছে, কিন্তু অন্যদিকে পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার গভীর আগ্রহ এবং প্রচেষ্টাও কম শক্তিশালী নয়। এই অধ্যায়ের পাঠগুলো নিয়ে চিন্তা করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের উপর আমাদের আস্থা আরও দৃঢ় করে তোলার চেষ্টা করব।

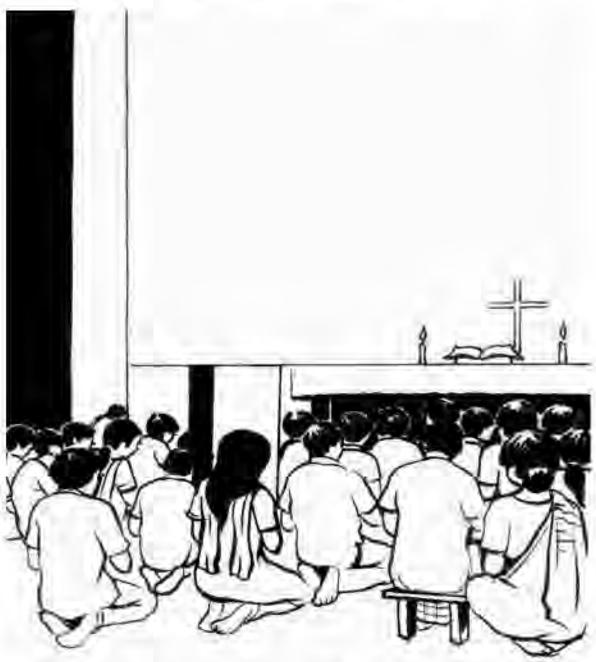

প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন ও তাঁর উপর আস্থা স্থাপন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- পতনের ফলে মানুষের কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দিতে পারব;
- মানুষকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করতে পারব;
- মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- জীবনের সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখব।

পাঠ ১ : পাপে পতন ও কঠিন সংগ্রাম

মানুষের পাপে পতন

নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন। মানুষের সামনে রেখেছিলেন মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল। ঈশ্বর মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ স্বেচ্ছায় সেই পাপ থেকে বিরত থাকুক। কিন্তু মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ঈশ্বরের অবাধ্য হলো। তার উপর ঈশ্বরের আস্থা মানুষ নষ্ট করে ফেলল। এভাবে মানুষ যে পাপ করল তাই মানুষের আদি পাপ। সেই পাপ দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের বদলে নিজের ইচ্ছাকেই বেছে নিল। ঈশ্বর মানুষকে নিজের মতো করেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মানুষ তা বুঝল না। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে মানুষ অন্যভাবে "ঈশ্বরের মতো" হতে চাইল। সে নিজেই ঈশ্বর হতে চাইল। কিন্তু তা আর তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তার এই অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই তার পতনের মূল কারণ হলো।

পাপের পরিণাম

পাপে পতিত হওয়ার ফলে আদম ও হবা তৎক্ষণাৎ আদি পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেলল। সাধু পল বলেন, "ইহুদি অনিহুদি, সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঐশ মহিমা থেকে বঞ্চিত।" (রোমীয় ৩:২৩)। পাপের ফলে আদি পিতামাতা ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করে।

পাপের পূর্বে মানুষের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তার দেহ, মন ও আত্মার সুসম্পর্ক ছিল। সুসম্পর্ক ছিল নারী ও পুরুষের মধ্যেও। কিন্তু পাপের ফলে এই সম্পর্ক নষ্ট হলো।

১। মানুষের দেহ ও মনের উপর আত্মার একটা প্রভাব ছিল। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবল ছিল। কিন্তু এখন সেই আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে গেল। দেহ ও মন এখন আর আত্মার নির্দেশ সেভাবে মানছে না।

২। নারী-পুরুষের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল। নারী ও পুরুষ সেই পাপাবস্থার কারণে পরস্পরকে কাম-লালসার দৃষ্টিতে দেখে এবং একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার প্রচেষ্টা চালায়।

৩। সৃষ্টির সাথেও তাদের ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতি এখন তার সাথে আর বন্ধুসুলভ আচরণ করবে না। পৃথিবীর মাটি তার জন্য অভিশপ্ত হয়ে থাকছে। তাকে বহু কষ্ট করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, পৃথিবীর বুক থেকে খাবার যোগাড় করতে হয়। ওই মাটি তার জন্যে এখন ফলায় যত রকমের আগাছা ও কাঁটাগাছ। স্থলভূমির উদ্ভিদ হবে তার খাদ্য।

৪। মানুষকে যে ধুলা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই ধুলাতেই তাকে আবার ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ মানব ইতিহাসে মৃত্যু প্রবেশ করল।

৫। আদিপাপের পর পৃথিবীর মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটল। তারা পরস্পরকে ঈর্ষা করতে শুরু করল। কাইন তার আপন ভাই আবেলকে হত্যা করল।

কঠিন সংগ্রামে পতিত মানুষ

মানুষ স্বাধীন হলেও আদি পিতামাতার পাপের কারণে তার উপর শয়তানের শক্তির প্রভাব সব সময় বিদ্যমান। আদি পাপের ফল হলো, "শয়তানের দাসত্ব যার ক্ষমতা রয়েছে মৃত্যুর উপর।" মানুষের ভিতরে মন্দতার প্রতি একটা আসক্তি আছে; সে না চাইলেও তার ভিতর থেকে তা উৎসারিত হয়। মন্দতার প্রতি এই আসক্তির কারণে মানুষের মধ্যে বোধহীনতা জন্ম নেয়। এই বোধহীনতার কারণে নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ নানারকম মারাত্মক ভুল করে থাকে। এই ভুলের কারণে মানুষের জীবন ক্রমান্বয়ে হতে থাকে জটিল ও কষ্টকর, তার অশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজের মধ্যে ও বাইরের জগতের সাথে তার সংগ্রামও এভাবে বেড়ে উঠতে থাকে।

মানুষের জীবনে পাপের প্রভাব এবং পাপের কারণে মানুষের জীবনে বিদ্যমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা টানাটানিটাই হলো তার কঠিন সংগ্রাম। এই সংগ্রাম হলো মন্দ বা পাপকে পরাজিত করে সত্য ও ভালোকে প্রতিষ্ঠা করার বিরামহীন প্রচেষ্টা। সব মানুষের মধ্যেই ভালো বা শুভশক্তি বিরাজমান। মানুষ ভালো ও সৎ থাকতে চায়। সত্য ও সুন্দরকে সব মানুষই ভালোবাসে। কিন্তু সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

মানব জাতির গোটা ইতিহাসই মন্দ শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। প্রভু যীশুর কথা অনুযায়ী তা ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে জগতের শেষদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই দ্বন্দ্বমুখর জগতে মানুষকে সংগ্রাম করেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে মানুষ তার অন্তরে ও নিজ জীবনে পরিত্রাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। মানুষের এই অসহায় অবস্থাকে সাধু পল এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : আমি যা করতে চাই, তা করি না বরং আমি যা করতে চাই না, তাই করি। তবে আমরা বিশ্বাস করি এই নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রাম খ্রিস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষা ও পরিত্রাণের সংগ্রাম। প্রতিদিনের জীবন যাপন ও প্রচেষ্টায় পাপ শক্তিকে পরাজিত করে শুভশক্তির জয়ের মাধ্যমেই আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে অভিজ্ঞতা করি। মৃত্যু বিজয়ের আনন্দ লাভ করি।

কাজ : প্রতিদিনের জীবনে শুভশক্তি ও পাপশক্তির দ্বন্দ্ব তুমি কীভাবে অভিজ্ঞতা কর তা অনুধ্যান কর ও দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ২ : পতিত মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা

ঈশ্বর অসীমরূপে মঙ্গলময় ও ভালোবাসাপূর্ণ। তাঁর সকল কাজ উত্তম। মানুষের প্রতি তাঁর ভলোবাসাও সীমাহীন। পাপ করে মানব জাতি পতিত হলেও ঈশ্বর কিন্তু তাদের একেবারে বিনাশ করলেন না। তাদেরকে চিরতরে দূরেও ঠেলে দিলেন না। মানব ইতিহাসে পাপ বিদ্যমান। তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তাই মানুষকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর একটি মহান পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পাপে পতিত হবার পর ঈশ্বর মানবজাতির কাছে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি মানবজাতির পরিত্রাণ করবেন। পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করবেন। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকের (আদি:৩:৯,১৫) এই অংশকে বলা হয় "প্রথম মঙ্গলসমাচার।" কারণ এখানে রয়েছে মশীহের বা ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে প্রথম ঘোষণা, সর্প ও নারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং নারীর বংশধরদের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কিত ঘোষণা।

এই প্রতিশ্রুতিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা "নতুন আদম" অর্থাৎ মুক্তিদাতা যীশুর আগমন সংবাদ জানতে পারি। যিনি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য ছিলেন। আদমের অবাধ্যতা ও পাপের ক্ষতিপূরণ তিনি

পরিপূর্ণভাবেই করেছেন। যে নারীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন যীশুর মা মারীয়া, "নতুন হবা"। যীশুর পুণ্য ফলে এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্কা বা পাপমুক্ত।

আমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে ঈশ্বর কেন আদি মানবকে পাপ করা থেকে রক্ষা করেননি? মহাপ্রাণ সাধু লিও বলেছেন, "আমাদের জন্য খ্রিষ্টের দেওয়া অবর্ণনীয় কৃপা-আশীর্বাদ সেই হিংসুটে শয়তানের কেড়ে নেওয়া আশীর্বাদের চেয়ে উত্তম।" সাধু টমাস আকুইনাস লিখেছেন, "মহত্তর কোনো কিছুর দিকে মানব স্বভাবের উন্নীত হবার পথে বাধা দেওয়ার মতো কোনো কিছু নেই, এমনকি পাপ করার পরও। ঈশ্বর মন্দতাকে ঘটতে দেন যেন তা থেকে আরও উত্তম কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।" সাধু পল বলেন, "যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল" এবং পুণ্য শনিবার রাতের নিস্তার-বন্দনায় গাওয়া হয়, "ধন্য সেই অপরাধ... যার জন্য আমরা এমন মহান এক ত্রাণকর্তাকে পেয়েছি।"

খ্রিষ্টভক্তরা সবসময় বিশ্বাস করে, "এই জগৎ সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা দিয়ে গড়া এবং এই ভালোবাসাই সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছে।"

কাজ : ব্যর্থতা বা মন্দ ঘটনা থেকে পরবর্তীতে ভালো কিছু অর্জিত হয়েছে এমন ঘটনা তোমার বেলায় ঘটে থাকলে বা তোমার জানা থাকলে তা সহভাগিতা কর।

পাঠ ৩ : ঈশ্বর-অন্বেষণ মানুষ

মানুষের জীবনের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন হলো : আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় যাব? কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন? কেন তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নগুলোকে মহামানবেরা জীবন জিজ্ঞাসা বলে উল্লেখ করেছেন। জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণ। মানুষ তার আপন স্রষ্টাকে খুঁজে পেতে চায়। তাঁর সাথে একাত্ম হতে চায়। তাঁর আপন স্রষ্টার মাহাত্ম্য মানুষ নিজ জীবনে উপলব্ধি করতে চায়। ঈশ্বরকে সে আস্বাদন করতে চায়, তিনি কত মঙ্গলময়। ঈশ্বরকে লাভ করা মানুষের অনন্ত পিপাসা। সামসংগীতেও আমরা মানুষের ঈশ্বর-অন্বেষণের বর্ণনা দেখতে পাই:

সামসংগীত ৬৩তে বলা হয়েছে : (সাম ৬৩)
ওগো, ঈশ্বর, তুমি তো আমার আপন ঈশ্বর, তোমাকেই খুঁজে ফিরি আমি;
তোমারই জন্যে তৃষিত আমার প্রাণ;
আমার এই দেহ তোমারই জন্যে ব্যাকুল,
যেন শুষ্ক তৃষাতুর জলহীন কোনো ভূমির মতো।

তাই তো এখন পুণ্য ধামের দিকে
ওগো, তোমারই দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি;
তোমার শক্তি, তোমার মহিমা দেখতেই চাই আমি।

সামসংগীত ৪২-এ উল্লেখ করা হয়েছে :

জলস্রোতের কাছে ব্যাকুল যেন হরিণীর মতো,
ওগো ঈশ্বর, তোমারই জন্যে ব্যাকুল আমার প্রাণ।

পরমেশ্বর, আহা, জীবনেশ্বর–
তাঁরই জন্যে তৃষিত আমার প্রাণ।
ঈশ্বরের কাছে, আহা, কবে যাব আমি,
কবে পার তাঁর শ্রীমুখের দর্শন?

মানুষ কেন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে? ঈশ্বর যিনি আমাদের স্রষ্টা তিনি নিজেই আমাদের সাথে মিলিত হতে চান। আমরাও যেন তাঁর সাথে মিলিত হতে চাই সেজন্য তিনি সেই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মধ্যে এমন একটা অপূর্ণতা দেয়েছেন, যা একমাত্র তিনি নিজেই পূর্ণ করতে পারেন। নদীর জলের উৎস হলো সাগর এবং তার পরিণতিও হলো সাগর। মানুষের জীবনও তেমনি। আমাদের উৎস হলেন ঈশ্বর, আমদের শেষ পরিণতিও তিনিই। আমরা তাঁর থেকে এসেছি, আমরা ফিরেও যাব তাঁর কাছে। যতদিন আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকি, তাঁরই গৌরবের জন্যেই বেঁচে থাকি। তাই মানুষ আমরা আমাদের জীবনের সব অবস্থায়, সব কাজে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে চাই। আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে দেখতে চাই। আমাদের সব কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই। ঈশ্বরকে লাভ করে আমরা পরিতৃপ্ত হতে চাই। ঈশ্বরকে পেয়ে আমরা পূর্ণ হতে চাই।

যুগ যুগ ধরে মানুষ নানাভাবে নানাস্থানে ঈশ্বরকে খুঁজেছে। সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই আমরা দেখি যে মানুষ ঈশ্বর বা তাঁর আপন স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষের ধ্যান, প্রার্থনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মপালন, পুণ্যকাজ, মানবসেবা, জ্ঞান অর্জন, তীর্থযাত্রা কিংবা সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষ তাঁর আপন স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায়। সৃষ্টজীবের প্রতি ভালোবাসা ও নিজ অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টাকে ভালোবাসে ও তাঁকে নিজ জীবনে অভিজ্ঞতা করে। কিন্তু অসীম ঈশ্বর আমার মধ্যেই আছেন। এই খুঁজে পাবার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল তাই তো লিখেছেন :

অন্তরে তুমি আছো চিরদিন, ওগো অন্তরযামী।
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তাই পাই না তোমারে আমি।
প্রাণের মতন আত্মার সম আমাতে আছো হে অন্তরতম।...

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছেন :

তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আরও কিছু নাহি চাই গো...

এভাবেই যুগের পর যুগ ধরে চলছে মানুষের বিরামহীন ঈশ্বর-অন্বেষণ।

কাজ : তুমি কীভাবে ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর? তার একটি তালিকা কর। ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার অভিজ্ঞতা ও আনন্দ দলে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪ : পরিত্রাণের উপায়

ঈশ্বরকে জানতে, তাঁর আজ্ঞাগুলো মেনে চলতে এবং এই পৃথিবী ও পরকালে পরম সুখে বাস করার জন্য ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ পাপ করে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই উদ্যোগ নিয়ে মানুষকে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষকে পরিত্রাণ দিতে চান। পাপের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের পরিত্রাণ। ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে মানুষ পরিত্রাণের পথে এগিয়ে চলতে পারে। এই কৃপা ঈশ্বর মানুষকে দান করেন তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে। তাছাড়াও তিনি মানুষের জন্য দিয়েছেন বিধি-বিধান। এই বিধানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ লাভ করবে ঐশ অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ। এবার আমরা জানব কীভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

১. প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা : মুক্তি পরিকল্পনায় ঈশ্বর নিজেই মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি মানব জাতিকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুর খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে। যীশু মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, পরিত্রাণ সম্পর্কে কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ এবং ক্রুশমৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়ে মানুষকে পাপমুক্ত করেছেন। তাহলে মানুষের পরিত্রাণের প্রধান উপায় হলো যীশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা। যীশু নিজেই বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।" (যোহন: ১৪:৬)।

২. নৈতিক বিধান পালন করা : পরিত্রাণ লাভের পথে ঈশ্বরের দেওয়া বিধি-বিধান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুরাতন নিয়মের দশ আজ্ঞা, প্রভু যীশুর দেওয়া ভালোবাসার আজ্ঞা মানুষের পরিত্রাণের পথ নির্ণয় করে। একদিন একটি যুবক যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "গুরু, বলুন তো শাশ্বত জীবন লাভ করতে হলে আমাকে কোন্ সৎ কাজ করতে হবে? ... যীশু উত্তর দিলেন ... জীবন রাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তুমি ঐশ আজ্ঞাগুলি পালন করে চল।" ঐশ আজ্ঞাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা হলো ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার বিধান পালন করেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।

৩. ঐশ অনুগ্রহ ও ধর্মময়তা : ঐশ অনুগ্রহ ও ধর্মময়তা আসে পবিত্র আত্মা থেকে। পবিত্র আত্মার ক্ষমতাবলে আমরা পাপের কাছে মরে গিয়ে নতুন জীবন অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভ করি। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রথম ফল হলো মনপরিবর্তন। মন পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি পাপের পথ থেকে মন ফিরিয়ে যীশুর পথ গ্রহণ করা, পরিত্রাণ লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা, পবিত্রতা লাভ করা ও বিশ্বাস নবীকরণ করা। এই ঐশ অনুগ্রহ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ঈশ্বরের দয়ার উপর। ঈশ্বরের নিজের জীবন থেকে তিনি তা আমদের দিয়ে থাকেন।

৪. খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হওয়া : খ্রিস্টভক্তদের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। মণ্ডলীতে স্বয়ং পবিত্র আত্মা বিরাজমান। মণ্ডলীর সহায়তায় সংস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সংস্কারগুলো হলো পরিত্রাণ লাভের পাথেয় স্বরূপ। যেমন দীক্ষাস্নান সংস্কার লাভের মধ্য দিয়ে ভক্তজনেরা আদি পাপের ক্ষমা লাভ করে, পুনর্মিলন সংস্কারের মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা লাভ করে এবং খ্রিস্টপ্রসাদ লাভের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুকে গ্রহণ করে পরিত্রাণ লাভ করে। এছাড়াও মণ্ডলীর প্রার্থনা, উপাসনা ও অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ

পরিত্রাণদায়ী কৃপা লাভ করে। খ্রিস্টভক্তের জীবনে মন্ডলী হলো খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী বাস্ত ব উপস্থিতির প্রমাণ। মন্ডলীর পরিচালনা ও খ্রিস্টীয় দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ভক্তজন পরিত্রাণের পথে এগিয়ে চলে।

৫. সেবাকাজ : সাধু যাকোব তাঁর ধর্মপত্রে বলেছেন, "কেউ যদি দাবি করে যে, ঈশ্বরে তার বিশ্বাস আছে, অথচ সে যদি সেইমতো কোনো সৎকর্ম না করে থাকে, তাহলে কীই বা লাভ তাতে? তেমন বিশ্বাস কি তাকে পরিত্রাণ এনে দিতে পারবে?" (যাকোব: ২:১৪)। সৎকর্মহীন বিশ্বাস নিষ্ফল, নিষ্প্রাণ। তাই আমাদের পরিত্রাণের জন্য যথাসাধ্য সেবাকাজ করতে হবে। সেবাকাজ করা খ্রিস্টীয় দায়িত্ব। শেষ ভোজে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে যীশু সে আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। সেবা কাজের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তরের ধার্মিকতা ফিরে পাই।

কাজ ১ : পরিত্রাণ লাভের জন্য তুমি যা যা কর তার একটি তালিকা প্রস্তু ত কর।

কাজ ২ : কী কীভাবে মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে দলে ভাগ হয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করে তা উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষকে ঈশ্বর ... ইচ্ছা দিয়েছিলেন।

২. পাপের পূর্বে ... মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

৩. কাইন তার আপন ভাই ... হত্যা করল।

৪. সব মানুষের মধ্যেই ভালো বা ... বিরাজমান।

৫. সত্য ও ... প্রতিষ্ঠা করা সব সময় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. মানুষ শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে	• মৃত্যু প্রবেশ করল
২. পাপের ফলে এই	• ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে চাই
৩. মানব ইতিহাসে	• আমরা পূর্ণ হতে চাই
৪. ঈশ্বর অসীমরূপে মঙ্গলময় ও	• সম্পর্ক নষ্ট হলো
৫. আমাদের সব কাজের মধ্য দিয়ে	• ভালোবাসাপূর্ণ
	• ঈশ্বরের অবাধ্য হলো

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে আবেলকে হত্যা করল?

ক. আদম খ. কাইন

গ. অব্রাম ঘ. যাকোব

২. মানুষের মধ্যকার সুসম্পর্ক নষ্ট হয় কেন?

ক. পাপের ফলে খ. যোগাযোগের অভাবে

গ. অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দিলে ঘ. মন্দতার কারণে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্ব র প্রশ্নের উত্তর দাও

ছোটবেলায় মিলন খুবই নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ছিল। হাইস্কুলে উঠে সে দুষ্টু ছেলেদের সাথে চলাফেরা করে এবং পিতামাতার অবাধ্য হয়। নিয়মিত পড়ালেখা করে না, প্রার্থনাও খুব একটা করতে চায় না। অর্থাৎ সে যে এখন অলস হয়ে গেছে তা তার ব্যবহারেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশেষে দেখা গেল সে অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো।

৩. কোন স্বভাবের বশবর্তী হয়ে মিলন মন্দ পথে অগ্রসর হলো?

ক. অসচেতনতা খ. ধৈর্যহীনতা

গ. পাপ স্বভাব ঘ. অনৈতিকতা

৪. মিলনের এ ধরনের জীবন যাপনের কারণে সে–

i. ঈশ্বরকে ভয় পেতে শুরু করে

ii. ঐশ মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়

iii. পবিত্রতার কৃপা হারিয়ে ফেলে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বেরোনিকা দরিদ্র পরিবারে লালিত পালিত হয়েছে। অনেক কষ্ট করে সে পড়ালেখা শিখেছে। সে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে, গির্জায় যায়, বেদি সাজায়, সাধু সাধ্বীদের জীবনীমূলক গ্রন্থ পাঠ করে। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে সে আনন্দ পায়। তার পিতামাতা তাকে বিয়ে দিতে চায় কিন্তু সে তাতে রাজি হয় না এই ভেবে যে ঐ জীবনে থেকে সে মণ্ডলীর লোকদের অনেক সেবা দিতে পারবে না। সে ধর্মীয় জীবন আহ্বানে সাড়া

দিয়ে দুঃখী দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু তার ছোট ভাই সুজন ছিল খুবই আরাম প্রিয়। কষ্ট করা তার পছন্দ নয়। সে পিতামাতাকে সব সময় অগ্রাহ্য করে। পিতামাতার দেখানো পথে চলে না। একবার সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনো চিকিৎসায়ই সে ভালো হচ্ছিল না। বেরোনিকা তাকে পরামর্শ দেয় যেন সে তার মন্দ পথ থেকে ফিরে আসে।

ক. কার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হলো?

খ. পাপে পতিত হওয়ার পূর্বে মানুষের জীবন কেমন ছিল এবং কেন ছিল?

গ. বেরোনিকা তার কাজের দ্বারা ঈশ্বরের কোন শিক্ষা বাস্ত বায়ন করতে চায়– আলোচনা কর।

ঘ. 'অনুশোচনা ও পাপ স্বীকারই সুজনকে সুস্থ করে তুলেছে' এ বিষয়ে তুমি কি একমত পোষণ কর? তোমার মতামত প্রদান কর।

২. রাজু শিশুকালেই তার বাবাকে হারান। তার বাবা মারা যাওয়ার পূর্ব থেকেই তার বাবা, কাকা ও জেঠাদের মধ্যে জমিজমা নিয়ে ঝগড়া ও মামলা চলছিল। মামলার দুশ্চিন্তায় তার বাবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। বাবার অনুপস্থিতিতে যেখানে দুমুঠো ভাত খাওয়াই রাজুর জন্য কঠিন বিষয় তার উপর প্রতি মাসে ২/১ বার করে কোর্টে হাজিরা দেওয়া ও তার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা এক যন্ত্রণা। দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্য সে নিজে তার জেঠা, কাকাদের অনুরোধ করেন যেন মামলা মোকদ্দমা পরিহার করে সুন্দর জীবনে ফিরে আসা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে। জীবিতকালে রাজু তার বুদ্ধিমত্তা ও নমনীয় আচরণের দ্বারা মামলার ঝামেলা মেটাতে পেরেছে।

ক. আদি পিতামাতার কাছ থেকে আমরা কী বিষয়ে জেনেছি?

খ. দ্বন্দ্বমুখর জগতে কীভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়– ব্যাখ্যা কর।

গ. কী কারণে রাজুকে অপরিণত বয়সেই সংগ্রাম করতে হয়? পাঠ্যপুস্ত কের শিক্ষার আলোকে তা বর্ণনা কর।

ঘ. 'রাজু তার সংগ্রামী জীবনের উত্তরণে যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে উপলব্ধি করতে পারে' বিষয়টির সাথে তুমি কি একমত পোষণ কর ? তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আদি পাপের বিষয় আমরা কীভাবে জেনেছি?

২. ঈশ্বর মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন কেন?

৩. মানুষ ঈশ্বরকে খোঁজে কেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পতনের ফলে মানুষের কঠিন সংগ্রামপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দাও।

২. পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণনা কর।

৩. জীবনের সর্বাবস্থায় ঈশ্বরের উপর কীভাবে আস্থা রাখবে ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

যীশুর বাণী প্রচারের মূলভাব

প্রভু যীশু খ্রিষ্ট পিতার ইচ্ছা অনুসারে এই জগতে এসেছেন মানব জাতির জন্য পরিত্রাণ অর্জন করতে। প্রকাশ্য প্রচার জীবনে তিনি তাঁর মুখনিশ্রিত বাণী ও আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে সত্য ও সুন্দরের পথে জীবন যাপন এবং ন্যায্যতা, শান্তি ও ভালোবাসার পথ অনুসরণ করার মতো সকল বিষয়ের দিক নির্দেশনা। বাণী প্রচারের মাধ্যমে যীশু খ্রিষ্ট মানুষকে ধীরে ধীরে পবিত্রাণের জন্য প্রস্তু ত করে তুলেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা প্রভু যীশুর বাণী প্রচারের প্রধান মূলভাবগুলোর উপর আলোকপাত করব।

যীশুর কাছে অসংখ্য জনতার ভিড়

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- যীশুর বাণী প্রচারের নিম্নলিখিত মূলভাবগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- ঈশ্বরের রাজ্য, দশ আজ্ঞা, সুখপন্থ াসমূহ, শেষ বিচার, মৃতদের পুনরুত্থান, যেরুসালেমের মন্দির, ইহুদিদের বিধান, শান্তি, দীনদরিদ্র, পবিত্র আত্মার বাণী ও মিশনকর্ম, এবং বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা। আমরা যীশুর প্রচারিত বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করব যীশুর কাজে যথাসম্ভব অংশগ্রহণ করব।

পাঠ ১ : ঈশ্বরের রাজ্য

প্রতিটি মানবীয় কাজেরই একটি কারণ থাকে। কারণ ছাড়া কোনো কাজকেই আমরা মানবীয় কাজ বলি না। আমরা যে পড়াশুনা করছি তার নিশ্চয়ই একটি কারণ রয়েছে। যেমন, আমরা লেখাপড়া শিখে বড় হবো, মানুষের মতো মানুষ হবো। প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করব। মানুষের মাঝে আমাদের কাজ দিয়ে উন্নত জীবন পথের সন্ধ্যান দিব। একইভাবে আমরা যে খাওয়াদাওয়া করি, বিশ্রাম করি, খেলাধুলা করি, গুরুজনদের বাধ্য হই ইত্যাদি সবকিছুরই একেকটি কারণ থাকে।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টও এই জগতে এসেছেন একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করতে– মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে। তিনি এসেছেন এই জগতের মাঝে ভালোবাসা, সেবা, ক্ষমা, একে অন্যের প্রতি মমতাবোধ, সহানুভূতি, ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্ত ার করতে। এই কারণে প্রভু যীশু তাঁর বাণী প্রচার জীবনে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে ঐশরাজ্য কাছে এসে গেছে। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্যে প্রবেশের জন্য হৃদয়মন প্রস্তু ত করে। প্রভু যীশুর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা এবং তাঁর মধ্য দিয়েই এই রাজ্য একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। তিনি ভালোবাসা, ক্ষমা, সেবা, মিলনের মধ্য দিয়ে এই জগতে তা প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

কিন্তু অনেকে যীশুকে ভুল বুঝেছে। তাঁকে অনেকে জাগতিক রাজা এবং তাঁর রাজ্যকে জাগতিক রাজ্য হিসাবে মনে করেছে। এমনকি তাঁর বারো জন শিষ্যের মধ্য থেকেও অনেকে তাঁর রাজ্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি। সেই কারণে প্রেরিত শিষ্য যাকোব ও যোহন প্রভু যীশু খ্রিস্টকে অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, তাঁদের একজন যেন একদিন তাঁর রাজ্যের ডান পাশে এবং অন্য জন তাঁর বা পাশে বসতে পারেন। তাঁদের বুঝতে ভুল হয়েছে যে, ঈশ্বরের রাজ্য সবার জন্যই। সেখানে প্রবেশ করার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। সেই রাজ্যে ডান পাশে বা বাম পাশে বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বরের রাজ্যে আমরা সবাই সমান। সবাই আমরা রাজা এবং একই সাথে সবাই প্রজা।

কাজ : সবাই মিলে, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে– গানটি করব।

পাঠ ২ : ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

নিয়মকানুন মানুষকে সুশৃঙ্খল করে। সহজ-সরল ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এই কারণে প্রতিটি সমাজ ও দেশে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। এগুলো পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে পারে।

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর প্রকৃতি প্রদত্ত কিছু নিয়ম দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি কিছু কিছু বিষয়ে বিধি-নিষেধও করেছেন। তিনি সিনাই পর্বতে মোশীর মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির জন্য দশটি আদেশ বা আজ্ঞা দান করেছেন। ঈশ্বরের সেই দশটি আজ্ঞা আমরা আগেই জেনেছি এবং সেগুলোর ব্যাখ্যাও শিখেছি।

কাজ : একজন একজন করে পাঁচ জন ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা বলবে।

মোশীর মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া দশটি আজ্ঞার সারাংশ হিসেবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট দুইটি মূল আজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন। এভাবে তিনি দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,

তুমি তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে। সুতরাং দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু মোশীর মাধ্যমে দেওয়া দশটি আজ্ঞার পূর্ণতা দান করেছেন। ভালোবাসাই সমস্ত কিছু করতে পারে। পূর্ণ অন্তর, মন ও শক্তি নিয়ে যদি ঈশ্বরকে এবং সকল মানুষকে ভালোবাসা যায় তাহলেই ঐশ বিধানের সমস্ত কিছু পালন করা হয়ে যায়। ভালোবাসা একমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি এবং সকল ভাইবোনদের অর্থাৎ সকল মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। এই কারণে প্রভু যীশু পরস্পরকে ভালোবাসার কথা বলেছেন।

কাজ : কীভাবে তোমরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা অনুসারে জীবন যাপন করতে পার তা দলে আলোচনা করবে।

পাঠ ৩: সুখপন্থাসমূহ

সব মানুষ জীবনে সুখী হতে চায়। মানুষের জীবন যাপন ও কাজকর্ম দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের জীবনের প্রধান ও পরম লক্ষ্যই হলো সুখে থাকা। সুখের জন্যই যেন মানুষ এই পৃথিবীতে সব কিছু করে যাচ্ছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সব ধরনের সুখ ও আনন্দ আমাদেরকে পরম বা স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। দুই ধরনের সুখ আছে। যথা: জাগতিক সুখ ও পারমার্থিক সুখ। জাগতিক সুখভোগ হলো এই জগতের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্য দিয়ে লব্ধ সুখভোগ। এগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভোগ করে থাকি। মূলত পাওয়ার বা ভোগের মধ্য দিয়েই আমরা এসব সুখের সন্ধান করি। পারমার্থিক সুখ হলো ত্যাগের মধ্য দিয়ে, একে অন্যকে দান করার মধ্য দিয়ে এই সুখ লাভ করা যায়। এই সুখ এই জগতে আমরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি ও পরজগতের জন্য সঞ্চয় করি। প্রভু যীশু তাঁর প্রচার জীবনের শুরুতে জাগতিক সুখভোগের চেয়ে পারমার্থিক সুখভোগের কিছু পনথা তুলে ধরেছেন। তিনি মোট আটটি সুখপনথার কথা বলেছেন। এগুলো আমাদের কাছে অষ্টকল্যাণ বাণী নামেও পরিচিত।

সুখ পন্থাসমূহ বা অষ্টকল্যাণ বাণী

১। অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা-স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

২। দুঃখে-শোকে কাতর যারা , ধন্য তারা-তারাই পাবে সান্ত্বনা ।

৩। বিনয়ী, কোমল প্রাণ যারা, ধন্য তারা-প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।

৪। ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্য তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা-তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

৫। দয়ালু যারা, ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে।

৬। অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে।

৭। শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা-তারাই পরমেশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে।

৮। ধর্মনিষ্ঠ বলে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা-স্বর্গ রাজ্য তাদেরই।

প্রভু যীশু খ্রিস্ট পর্বতে দেওয়া তাঁর এই আটটি কল্যাণ বাণীর মধ্য দিয়ে এই জগতে ও পর জগতে সুখভোগ করার পথ দেখিয়েছেন। এই বাণীর আলোকে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে আমরা হৃদয় ও মনে শান্তি অনুভব করব ও সেই শান্তি একে অন্যের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারব।

পাঠ ৪ : শেষ বিচার

মানুষ এ জীবনে ভালো ও মন্দ যেসব কাজ করে তার জন্য তাকে পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। এ জীবনে না হোক পরজীবনে তার এসব ভোগ করতে হয়। এই পৃথিবীতে যে যেমন জীবন যাপন করবে সেই ভাবেই সে পরজীবনের জন্য স্থান প্রস্তু ত করবে। মানুষের জীবন যাপন ও কাজের উপর ভিত্তি করে শেষ বিচারের রায় হবে। যার যার কাজ অনুসারে তার তার বিচার হবে। মোট কথা সব মানুষকেই একদিন বিচার আসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে শেষ বিচার অবসম্ভাবী। আমরা সবাই তা বিশ্বাস করি।

শেষ বিচারে মানব পুত্র (যীশু খ্রিস্ট) আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে স্বর্গদূতদের নিয়ে আসবেন এবং সিংহাসনে বসবেন। তাঁর সামনে সবাইকে তখন সমবেত করা হবে। বিচার হবে অনেকটা মেষপালক যেমন ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, তেমনি তিনিও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করবেন। ধার্মিক মানুষকে তিনি তাঁর ডান পাশে রাখবেন এবং মন্দ লোকদের তাঁর বাম পাশে রাখবেন। তাঁর ডান পাশের লোকদের তিনি বলবেন, তোমরা এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা। জগতের সৃষ্টির সময় থেকে তোমাদের জন্য যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা নিজেদের বলে গ্রহণ কর। কারণ তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্তকে জল দিয়েছিলে; বিদেশিদের আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্র হীনকে পোশাক পরিয়েছিলে; অসুস্থ ও পীড়িতকে সেবা করেছিলে; কারাবন্দিকে দেখতে গিয়েছিলে। এসব তুচ্ছতমদের জন্য তোমরা যা-কিছু করেছ তা সবই আমারই জন্য করেছ।

অন্য দিকে অধার্মিকদের তিনি বলবেন, আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, যত অভিশাপের পাত্র যারা। তোমাদের জন্য যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা আছে, সেখানেই যাও। কারণ তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্তকে জল দাওনি; বিদেশিকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্র হীনকে পোশাক দাওনি; অসুস্থকে সেবা করনি; কারাবন্দিকে দেখতে যাওনি। তিনি তখন তাদের শাশ্বত দণ্ডলোকে পাঠিয়ে দেবেন।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের একদিন সবাইকে বিচারের আসনের সামনে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিচার হবে ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডে অর্থাৎ আমরা এ জগতে তুচ্ছতম মানুষের জন্য কতটুকু করেছি তার উপর ভিত্তি করে।

কাজ : আমরা কী কী কাজ করলে শাশ্বত জীবনলোকে যেতে পারব তার একটা তালিকা প্রস্তু ত করব।

পাঠ ৫ : মৃতদের পুনরুত্থান

আমরা যেমন একদিন এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি তেমনি এ জগতের মায়ামোহ পরিত্যাগ করে একদিন আমাদের পিতার কাছে চলে যেতে হবে। যেহেতু মৃত্যুটা আমরা কেউ কখনো কামনা করি না তাই তা নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। মৃত্যু কেন হয়? মৃত্যুর পর আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় যাব? ইত্যাদি। কারণ এধরনের অজানা বিষয়ের প্রতি সব মানুষের এক ধরনের উৎকণ্ঠা কাজ করে। সেই কারণে মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে কম বেশি সবারই উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

পুনরুত্থিত প্রভু যীশু

আমরা মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি। কারণ প্রভু যীশু খ্রিষ্ট নিজে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং তিন দিন পর পুনরুত্থান করেছেন। তিনি পুনরুত্থান করে আমাদেরকেও তার পুনরুত্থানের সহভাগী করেছেন। তিনি তাঁর প্রচার জীবনেও পুনরুত্থানের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। ইহুদিরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু অন্য দিকে সাদুকীরা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন না। এই সাদুকীরা যখন যীশুকে পুনরুত্থানের বিষয় প্রশ্ন করেন তখন তিনি তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, মৃতদের একদিন পুনরুত্থান ঘটবে। তবে পুনরুত্থানের পর মানুষ আর এই জগতের মানুষের মতো সব কিছু করবে না। পুনরুত্থানের পর তারা সবাই স্বর্গদূতদের মতো হয়ে উঠবে। তাদের চেহারার মধ্যে সেই স্বর্গদূতদের মতো ভাব ফুটে উঠবে। এই কারণে প্রভু যীশু যখন পুনরুত্থান করে শিষ্যদের সাথে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেনি। যীশু বলেন, পরমেশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদের ঈশ্বর। আমরা একদিন প্রত্যেকে পুনরুত্থান করব। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা মহান ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করব। সেই কারণে মৃত্যু কষ্টের নয় বরং খ্রিষ্ট বিশ্বাসী সবার জন্য তা মহা আনন্দের হওয়া উচিত।

পাঠ ৬ : যেরুসালেম মন্দির

প্রতিটি ধর্মেই ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য বা উপাসনার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। যেমন, ইসলাম ধর্মে আছে মসজিদ, হিন্দু ধর্মে মন্দির, বৌদ্ধধর্মে প্যাগোডা এবং খ্রিষ্ট ধর্মে আছে গির্জা, মন্দির বা উপাসনালয়। এই পবিত্র স্থানগুলো সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির চিহ্ন বহন করে।

প্রভু যীশু খ্রিস্টের সময়ে ইহুদিদের উপাসনার প্রধান কেন্দ্র ছিল যেরুসালেম মন্দির। বছরের বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে ইহুদিরা একত্রে মিলিত হতো। প্রভু যীশু খ্রিস্টের যেরুসালেম মন্দিরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর জন্মের চল্লিশ দিন পরে যোসেফ ও মারীয়া তাঁকে এই মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে এই মন্দিরেই পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে পিতার কাজেই তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাঁর প্রকাশ্য জীবনে প্রতি বছর অন্ততপক্ষে নিস্তার পর্বের সময় তিনি যেরুসালেম মন্দিরে যেতেন।

এই মন্দির হলো ঈশ্বরের গৃহ, যেখানে সকল জাতির মানুষ এসে প্রার্থনা করবে। সেই কারণে প্রভু যীশু একবার মন্দিরে ঢুকে যখন দেখলেন মন্দিরের পবিত্র স্থানটি বেচা-কেনার বাজারে পরিণত হয়েছে তখন তিনি তাদের বের করে দিলেন। বেচা-কেনার সব কিছু তিনি উল্টে ফেলে দিলেন। তিনি পিতার গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হতে দেননি।

পাশাপাশি প্রভু যীশুর দেহ মন্দিরের কথাও বলেছেন। আমাদের দেহ হলো ঈশ্বরের মন্দির। এই হৃদয়রূপী পুরনো মন্দির তিনি ভেঙে ফেলে তিন দিনের মধ্যে নতুন হৃদয় মন্দির গড়তে চেয়েছেন। যদিও অনেকে তাকে ভুল বুঝেছে, তারপরও তিনি তাঁর বাণী প্রচারে যেরুসালেম মন্দিরকে কেন্দ্রে রেখেছেন। এই যেরুসালেমই ছিল তার প্রচার ও চূড়ান্ত লক্ষ্য যেখানে তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করেছেন।

পাঠ ৭ : ইহুদিদের বিধান

সব ধর্মেই কিছু-না-কিছু নিয়ম কানুন বা বিধি-বিধান থাকে। এই নিয়ম বা বিধান পালনের মধ্য দিয়ে প্রথমত ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিধি-বিধান পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ সত্য পথে পরিচালিত হতে পারে ও স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে।

ইহুদি ধর্মের অনেক নিয়মকানুন বা বিধিবিধান একান্ত পালনীয় ছিল। অনেকে মনে করেছিল প্রভু যীশু সব নিয়মকানুন বা বিধিবিধান বাতিল করতে এসেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই পর্বতের উপর উপদেশে এই বিষয়ে বলেছেন, "তোমরা এই কথা মনে করো না যে, আমি মোশীর বিধান বা প্রবক্তাদের নির্দেশ বাতিল করতে এসেছি। আমি তা বাতিল করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আকাশ ও পৃথিবী যতদিন বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের বিন্দুবিসর্গও লোপ পাবে না; তার আগেই যা-কিছু ঘটবার কথা সবই ঘটবে। তাই এই সব আদেশের মধ্যে গৌণতম আদেশগুলোর একটিও যদি কেউ লঙ্ঘন করে আর অপরকে লঙ্ঘন করতে শেখায়, তাহলে স্বর্গরাজ্যে সে তুচ্ছতম বলেই গণ্য হবে। কিন্তু যদি কেউ সেই সব আদেশ পালন করে ও পালন করতে শেখায়, তাহলে স্বর্গরাজ্যে সে মহান বলেই গণ্য হবে।" (মথি ৫:১৭-১৯)।

যীশু খ্রিস্ট এই বিধানগুলো পালনে আরও বেশি করে বিশ্বস্ত হতে বলেছেন। এগুলো পালন সম্পর্কে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আরও বেশি কঠিন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন, "তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালের মানুষদের এই কথা বলা হয়েছিল– হত্যা করবে না; যে কেউ হত্যা করবে, তাকে তার জন্য বিচারসভায় জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি– যে কেউ নিজের ভাইয়ের উপর রাগ করবে, তাকে তার জন্যে বিচারসভায় জবাবদিহি করতেই হবে। আর ভাইকে যে অপদার্থ বলবে, তাকে তো মহাসভাতেই জবাবদিহি করতে হবে। আর ভাইকে যে পাষণ্ড বলবে, তাকে নরকের আগুনেই জবাবদিহি করতে হবে।" (মথি ৫:২১-২২)।

প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুর পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই যারা এই বিধান পালন করে ও অন্যকে পালন করতে শিক্ষা দেয় তারা স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে। এই বিধি-বিধান ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে আমাদের সাহায্য করে। প্রভু যীশু খ্রিস্ট সমস্ত বিধানের একটি নতুন রূপ দান করেছেন। ইহুদিরা তা আক্ষরিকভাবে পালন করত। কিন্তু যীশু খ্রিস্ট তার আধ্যাত্মিক রূপ দান করেছেন। তাঁর বিধান হলো ভালোবাসার বিধান।

কাজ : কেন নিয়ম পালন করতে হয় তা দলীয়ভাবে আলোচনা করবে।

পাঠ ৮ : শান্তি

সব মানুষই শান্তি কামনা করে। একটু সুখের, একটু শান্তিতে জীবন যাপন করার জন্য মানুষ কত কী-ই না করে থাকে। অনেকে আবার দূরদূরান্তে পাড়ি জমায় একটু শান্তির আশায়।

যীশু খ্রিস্ট হলেন শান্তিরাজ। শান্তিরাজ প্রভু যীশুর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে বিভিন্ন প্রবক্তা ত্রাণকর্তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে এই আখ্যাই দিয়েছেন। তিনিই "অনন্য মন্ত্রণাদাতা", "বিশ্ব শান্তিরাজ" ।

যীশু তাঁর প্রচার জীবনে মানুষের মাঝে শান্তি বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি।" মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর যখন তিনি শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছেন তখন শিষ্যদের মাঝে শান্তি বিলিয়ে দিয়ে বলেছেন 'তোমাদের শান্তি হোক।' তবে প্রভু যীশুর দেওয়া শান্তি, এ জগৎ সংসার যেভাবে শান্তি দেয় তার মতো নয়। কিন্তু প্রভু যীশুর শান্তি ত্যাগের মধ্য দিয়ে; দান করার মধ্য দিয়ে। ভোগে নয় ত্যাগের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে তিনি শান্তি বিলিয়ে গেছেন, যেন আমরা সবাই শান্তির মানুষ হতে পারি।

প্রভু যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে পুনর্মিলিত করেছেন এবং মন্ডলীকে করে তুলেছেন মানব জাতির মধ্যে ঐক্যের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর মিলনের চিহ্ন, কেননা তিনি নিজেই আমাদের মাঝে শান্তি দিতে এসেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, শান্তির সাধক যারা তারাই সুখী হবে।

কাজ : নিজ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষে সর্বদা শান্তি বজায় রাখার জন্য করণীয়সমূহ বাড়ি থেকে লিখে আনবে।

পাঠ ৯ : দীন-দরিদ্র

যীশু খ্রিস্ট পর্বতের উপর যে কথা বলে তাঁর উপদেশবাণী শুরু করেছেন তা হলো, "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা-স্বর্গরাজ্য তাদেরই।" প্রভু যীশু ঈশ্বর-পুত্র হয়েও অতি দীন বেশে এই জগতে এসেছেন। অতি সাধারণ একটি কন্যা, কুমারী মারীয়ার গর্ভে এসে দীন-দরিদ্র বেশে গোশালায় জন্মগ্রহণ করলেন।

তিনি এই জগতে এসেছেন অতি সাধারণ বেশে, দীন-দরিদ্রদের মাঝে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে। নাজারেথের সমাজগৃহে যীশু খ্রিস্ট প্রবক্তা ইসাইয়ার ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করে এ জগতে তাঁর আসার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। "তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন-দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে; বন্দির কাছে মুক্তি আর অন্ধের কছে নবদৃষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে।" (লুক ৪:১৮)। তিনি তাঁর প্রচার জীবনে যে বারোজনকে মনোনীত করেছেন তারা সবাই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যাদের কাছে

মঙ্গলবাণী প্রচার করেছেন তারাও সমাজের অবহেলিত, লাঞ্ছিত, অভাবী, দুঃখী, বিধবা, অসুস্থ, পঙ্গুদের কাছে তাঁর আশার বাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, পিতা ঐশ রাজ্যের মর্মসত্য সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেবার জন্য। তিনি সবাইকে শিশুর মতো সরল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ শিশুর মতো সহজ-সরল হতে না পারলে কেউ ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

পাঠ ১০ : পবিত্র আত্মার বাণী ও প্রেরণকর্ম

প্রভু যীশু এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যাবার আগে বলেছেন যে, তিনি তাঁর অনুসারীদের অনাথ করে রেখে যাবেন না। তিনি এক সত্যময় আত্মা আমাদের দান করবেন, যিনি পূর্ণ সত্যের পথে আমাদের পরিচালিত করবেন। পবিত্র আত্মার বাণী পথপ্রদর্শক হবে এবং তাঁর শক্তিতে প্রেরণকর্ম পরিচালিত হবে।

পিতা যখন তাঁর বাণী প্রেরণ করেন, তিনি সব সময়ই তাঁর প্রাণবায়ুকেও দান করেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বাণী আমাদের মাঝে এসেছে। কিন্তু আত্মা আমাদের বুঝিয়ে দেন–যদিও প্রেরণকর্মে পুত্র ও আত্মা স্বতন্ত্র তবুও অবিচ্ছেদ্য। অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি খ্রিষ্টকে আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু তাঁকে প্রকাশ করেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। সেই কারণে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট বলেন যে, যখন আমারই কারণে তোমাদের সমাজগৃহে বা শাসনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে তখন কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে তা নিয়ে কোনো চিন্তা করো না। তোমাদের তখন যা-কিছু বলতে হবে তা পবিত্র আত্মাই শিখিয়ে দেবেন। প্রেরণকর্মে পবিত্র আত্মার বাণীই হবে আমাদের চালিকাশক্তি। পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বর সন্তানে পরিণত করবেন। তাঁর কাজ হচ্ছে আমাদেরকে খ্রিষ্টের সাথে যুক্ত করা ও খ্রিষ্টের আশ্রয়ে জীবনযাপন করতে সহায়তা করা।

অনুসন্ধানমূলক কাজ : ধর্মপল্লিতে খ্রিষ্টমণ্ডলী কী কী প্রেরণকর্ম করছে এবং সেই কাজগুলোর মাধ্যমে সমাজের লোকদের কী কী উপকার সাধিত হচ্ছে তার উপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তু ত কর।

পাঠ ১১ : বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা

আমরা জানি, বিবাহ সাক্রামেন্ত অনুষ্ঠিত হয় একজন ছেলে (পুরুষ) ও একজন মেয়ের (নারী) মধ্যে। তারা সারা জীবন এক সাথে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে গির্জায় গিয়ে ফাদারের উপস্থিতিতে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করে। ঈশ্বর নিজেই তাদের মিলন করিয়ে দেন। তাই সারা জীবন তারা এক সাথে থাকে। একমাত্র মৃত্যু এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে, আর কেউ নয়।

ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন যেন তাদের সম্মিলিত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে পরিপূর্ণতা আসে। পুরুষ ও নারী করে সৃষ্টি করে তিনি বিবাহ ব্যবস্থার দ্বারা জীবন ও প্রেমের যে ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটে তা প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং ঈশ্বরই বিবাহ বন্ধনের রচয়িতা। সেই কারণে বিবাহ শুধু যে একটি সামাজিক বা মানবীয় ব্যবস্থা তা নয়। বরং দাম্পত্য জীবনে নর-নারীর সাথে ঈশ্বরের এক অবিচ্ছেদ্য মিলন সংঘটিত হয়, যা কখনো fvOvi নয়। শাস্ত্র বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়, "তারা আর দুইজন নয়, কিন্তু একদেহ।"

বিবাহের ভোজে নিমন্ত্রিত অতিথি

যীশু খ্রিস্ট দাম্পত্য জীবনের এই প্রেমের মিলনকে শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি তাঁর প্রকাশ্য জীবনের শুরুতে তাঁর মায়ের সাথে কানা নগরের বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করে এখন থেকে বিবাহ হবে খ্রিস্টের উপস্থিতির ফলপ্রসূ চিহ্ন। আদি থেকেই সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় নর-নারীর মিলনের যে মূল অর্থ ছিল প্রভু যীশু তাঁর প্রচার জীবনে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। কারণ ঈশ্বর তা নিজেই স্থির করে দিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি যা মোশীর বিধানের চেয়ে ভারী। তিনি বলেন, "ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করে।" যেন বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা, মাধুর্য, সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকে। যেন পারস্পরিক সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. আমরা মৃতদের ... বিশ্বাস করি।

২. মন্দির হলো ... গৃহ।

৩. ঈশ্বরের বিধান হলো ... বিধান।

৪. খ্রিষ্ট হলেন ...।

৫. যীশু খ্রিস্ট দাম্পত্য জীবনের প্রেমের মিলনকে ... করেছেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. প্রেরণকর্মে পবিত্র আত্মার বাণীই হবে	• ধন্য তারা স্বর্গরাজ্য তাদেরই
২. অন্তরে যারা দীন	• সবার জন্যই
৩. পবিত্র আত্মার বাণী	• আমাদের চালিকাশক্তি
৪. ঈশ্বরের রাজ্য	• ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে
৫. তোমার সমস্ত অন্তর, মন দিয়ে	• পথ প্রদর্শক হবে
	• পরস্পরকে ভালোবাসার কথা বলেছেন

৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত দিন পর যীশু পুনরুত্থান করেছেন?

ক. দুই দিন খ. তিন দিন

গ. চার দিন ঘ. পাঁচ দিন

২. কীভাবে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি?

ক. ভালোবাসার মাধ্যমে খ. অনুগ্রহের মাধ্যমে

গ. অনুদান দিয়ে ঘ. বিধি বিধান পালন করে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মিথুন লেখাপড়ায় দুর্বল হলেও ঈশ্বরভীরু ও পরোপকারী। খুব সহজেই অন্যকে সে আপন করে নেয়। কারোর সাথে বিবাদ হলে নিজেই মীমাংসা করে। অবহেলিত মানুষের জন্য যথাসম্ভব কাজ করে। তাকে দেখে অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করে।

৩. মিথুনের এই কাজগুলোর মাধ্যমে কিসের প্রকাশ ঘটেছে?

ক. জাগতিক রাজ্যের খ. ঐশরাজ্যের

গ. আধিপত্য বিস্ত ারের ঘ. সৃষ্টির লালনের

৪. মিথুন তার কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চায়–

i. ভালোবাসা, সেবা

ii. ক্ষমা, শান্তি

iii. মমতাবোধ ও সহানুভূতি।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অপু ও তপু দু'জনেই বড়লোক পরিবারের সন্তান। অপু অবাধ্য, লেখাপড়া করে না, রাত করে ঘরে ফেরে। বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে না। অন্যদিকে তপু ঈশ্বরভীরু ও প্রার্থনাশীল। সকলের সেবা ও সহযোগিতা করে। তপুর জীবন দেখে অপু আফসোস করে এবং মন পরিবর্তন করে। দু'জনে সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করে। সাধারণ খাবার খায়। পোশাকেও শালীনতা বজায় রাখে। দু'জনেই প্রার্থনা করে এবং সমাজের দীন, দরিদ্র, দুঃখী, বিধবা ও অসুস্থ লোকদের মাঝে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে। ঐশবাণীর মর্মসত্য তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকে। ফলে সকলেই আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ক. ঈশ্বরের রাজ্য কাদের জন্য?

খ. আমরা কীভাবে সুখ লাভ করতে পারি?

গ. অপু ও তপু কোথাকার বাসিন্দা? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অপু ও তপুর মধ্যে যেন ঈশ্বরের সন্তানের ছায়া পড়েছে– উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. সঞ্জিত সর্বদা সত্য কথা বলে, কারণ সে ঈশ্বরকে ভয় করে। সে নিয়মিত বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করে। বাড়ির পাশের যে অসহায় মানুষ রয়েছে তাদের অর্থ, খাদ্য, পোশাক ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে। কেউ অসুস্থ হলে আগেই এগিয়ে যায়। প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ফাদার তার এই কাজের আগ্রহ দেখে সঞ্জিতকে ডেকে বললেন, 'তোমার কল্যাণ হউক।' কিন্তু সে নিজেকে সব সময়ই ক্ষুদ্র মনে করে।

ক. কাকে ঈশ্বর ডান পাশে রাখবেন?

খ. আমরা কেন মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি?

গ. সঞ্জিতের কাজের মাধ্যমে কোন শিক্ষাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সঞ্জিতের এ কাজের ফল কী হতে পারে ? তোমার পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে বিশেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রভু যীশু কোন বিশেষ কাজ করতে পৃথিবীতে এসেছেন?

২. দশ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা কর?

৩. সুখ পন্থাগুলোর আলোকে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে কী করতে পারব?

বর্ণনামুলক প্রশ্ন

১. ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২. সুখ পন্থাগুলো কী কী?

৩. মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমার পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে লেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের আহ্বানে পিতরের সাড়াদান

সাধু পিতর

যীশু তাঁর বাণী প্রচারের কাজে বারো জন সহযোগীকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদেরকে তিনি আহ্বান করেছেন এবং তাঁরাও সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে যীশুর শিষ্য হয়ে উঠেছেন। তাঁদের তিনি নাম দিয়েছেন প্রেরিত শিষ্য বা প্রেরিত দূত। কারণ তাঁরা জগতের সর্বত্র প্রেরিত হয়েছিলেন। সাধু পিতর ছিলেন প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান। এই অধ্যায়ে সাধু পিতরের আহ্বান ও তাঁর সাড়াদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা সাধু পিতরের আদর্শে যীশুর প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- যীশু কর্তৃক পিতরের আহ্বান ও যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদান ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পিতরের উপর যীশুর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভিত্তি হিসেবে পিতরের বিষয় বর্ণনা করতে পারব;
- পিতরের পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়ার কথা বর্ণনা করতে পারব;
- পিতরের বেঁধে রাখার ও খুলে দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পিতরের মসীহ বলে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- যীশুর যোগ্য শিষ্য হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হবো।

পাঠ ১ : পিতরের আহ্বান ও সাড়াদান

পিতা ঈশ্বরের মুক্তি-পরিকল্পনা বাস্ত বায়ন করতে যীশু এ জগতে এসেছেন। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মুক্তির বাণী সবাইকে শুনিয়েছেন এবং আহ্বান করেছেন যেন সবাই তাঁর দেখানো ধর্মপথে চলে। তিনি স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। ধর্মের এই বাণী প্রচার করা সহজ কাজ ছিল না। এর জন্য তাঁকে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তিনিই পথ, সত্য ও জীবন। তাঁর মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

বাণী প্রচারের এই কঠিন কাজটি করার জন্য তিনি কয়েকজন সঙ্গী বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদেরকে তিনি আহ্বান করেন, গঠন দেন এবং বাণী প্রচার করার জন্য সর্বত্র প্রেরণ করেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে তাঁদের উপর পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করে তিনি তাঁদের সাহসী ও শক্তিশালী করে তোলেন। এই সঙ্গী-দলের সদস্য সংখ্যায় অনেক ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে তিনি বারো জনকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন, আর তাঁদের নাম দিয়েছেন প্রেরিত শিষ্য বা প্রেরিত দূত। কারণ তাঁরা যীশুর প্রচার, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষী ছিলেন।

এই বারো জন প্রেরিত দূত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যীশুর সংস্পর্শে এসেছেন। একই এলাকার বাসিন্দা হিসেবে হয়তো তাঁরা ছোটবেলা থেকেই পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। আবার মন্দিরে যীশুর হারিয়ে যাওয়া, পণ্ডিতদের সাথে তত্ত্বালোচনা, কানা নগরের বিয়ে বাড়িতে আশ্চর্যকাজ এসব কারণেও যীশু তাঁর নিজ এলাকায় সকলের কাছে পরিচিত হয়ে থাকতে পারেন। এসব ঘটনার শ্রোতা হিসেবে শিষ্যেরা হয়তো আগে থেকেই যীশুর পরিচয় জানতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ হয়তো দীক্ষাগুরু যোহনের কাছ থেকে যীশুর পরিচয় শুনে থাকতে পারেন। ফলে যীশুকে দেখার কিংবা তাঁর সংস্পর্শে যাওয়ার ইচ্ছা হয়ত তাঁদের অন্তরে আগে থেকেই ছিল।

তখনকার বাস্ত বতায় সাগরতীরে ছোট ছোট নগর বা বসতি গড়ে উঠেছিল। আর যীশু সাগর তীরের এসব নগর-বন্দর ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করেছিলেন। নৌকা, মাঝি, জেলে ছিল যীশুর প্রচার কাজের মাধ্যম। শিষ্যদের যীশুকে দেখার সুপ্ত বাসনাটি পূর্ণ হয়, যখন যীশু শিষ্যদের নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করতে যান। ফলে যীশুর সঙ্গে তাঁদের সরাসরি দেখা হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে পিতরও ছিলেন। সেখানেই যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য তাদের প্রতি চূড়ান্ত আহ্বান আসে। সাধু লুক খুব চমৎকারভাবে তাঁর লেখা মঙ্গলসমাচারে এই ঘটনাটি প্রকাশ করেছেন।

জেলেরা সারা রাত জাল ফেলে কোনো মাছ ধরতে পারেননি (লুক ৫:১-১২)। তাঁদের জন্য সেই রাতটি খুব খারাপ ও ক্লান্তিকর রাত ছিল। সকালে যীশুকে তীরে দেখতে পেয়ে পিতর লাফ দিয়ে যীশুর কাছে আসেন। তাঁদের ব্যর্থ অভিযানের কথা যীশুর সাথে সহভাগিতা করেন। এই পরিস্থিতিতে যীশু পিতরকে বললেন, "নৌকাটা এবার গভীর জলে নিয়ে যাও আর মাছ ধরার জন্য জাল ফেল।" সারা রাতের ব্যর্থতা ও ক্লান্তির জন্য যীশুর এই আদেশ পিতরের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে কিছুটা ইতস্ত ত ভাব থাকলেও যীশুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থার ফলেই তিনি যীশুর কথার বাধ্য হলেন। তাঁরা সাগরে জাল ফেললেন। আর কী আশ্চর্য! এত মাছ ধরা পড়ল যে জালটা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো! ফলে অন্য জেলেদের সহযোগিতা নিতে হলো আর প্রচুর মাছ ধরা পড়ল।

যীশুর সম্বন্ধে শিষ্যেরা যা শুনেছিলেন, আজ নিজেদের চোখেই তাঁরা তা দেখলেন। তা সত্যিই আশ্চর্য কাজ। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, যখন তাঁরা যীশুর আহ্বান পেলেন, "এখন থেকে মানুষই ধরবে তোমরা।" ফলে জেলেদের জীবনে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। শুধু যে প্রচুর মাছই ধরা পড়ল, তা নয়। এবার তাদের জীবনটাই যীশুর কাছে ধরা পড়ে গেল। তাঁরা আর মাছ ধরার জেলে রইলেন না, বরং মানুষ ধরার জেলে হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এবার তাঁরা যীশুর প্রচার জীবনের সঙ্গী হয়ে গেলেন। আশ্চর্য ঘটনা এই যে, তাঁরা তাঁদের জাল, নৌকা, মাছ, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সব ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গ নিলেন। তাঁদের মধ্যে পিতরও ছিলেন।

যীশুর কী আশ্চর্য ক্ষমতা! কত সহজেই না তিনি পিতরকে তাঁর দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত তা থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সেবা কাজে নিয়োজিত করলেন। যীশুর মুখের কথা, চোখের দৃষ্টি পিতরের মন আকর্ষণ করেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এ এক চমৎকার আহ্বান–একটি আধ্যাত্মিক আহ্বান। ঈশ্বরের সেবা করার আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতর সবকিছু ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গ নিলেন।

কাজ : যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদানের ঘটনাটি দলীয়ভাবে অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ ২ : দায়িত্ব অর্পণ ও মন্ডলীর ভিত্তি

সাধু পিতর গালিলেয়া প্রদেশের বেথসাইদা গ্রামের লোক ছিলেন। তাঁর অন্য আরেকটি নাম হলো শিমন। শিমনকে যীশুই পিতর নাম দিয়েছিলেন, যার অর্থ হলো পাথর। শিমন পিতরের পিতার নাম ছিল যোনা। তাঁর অন্য ভাইয়ের নাম ছিল আন্দ্রিয়, তিনিও যীশুর শিষ্য ছিলেন। তাঁরা পেশায় ছিলেন জেলে। জেবেদের ছেলে যাকোব ও যোহনের সাথে পিতর ও আন্দ্রিয় সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ করতেন। যীশু পিতরের শাশুড়িকে সুস্থ করেছিলেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, পিতর বিবাহিত ছিলেন। তবে কোথাও উল্লেখ নেই তাঁর স্ত্রী জীবিত কিংবা মৃত ছিলেন।

যীশু প্রথম যাদেরকে আহ্বান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শিমন পিতর ছিলেন অন্যতম। সমুদ্রে মাছ ধরার সময় যীশু পিতরকে আকস্মিকভাবে আহ্বান করেন। যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতর হয়ে ওঠেন শিষ্যদলের প্রধান।

শিষ্যদের যাচাই করার জন্য একবার যীশু জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কে এই বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে লোকেরা কী বলে। সেই উত্তর শোনার পর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কে এই বিষয়ে শিষ্যেরা নিজেরা কী বলেন। শিষ্যদের মধ্যে পিতর বলেছিলেন, "আপনি মুক্তিদাতা, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" (মথি ১৬:১৩-২০)। শিষ্যদের মধ্যে পিতরই প্রথম যিনি যীশুকে মুক্তিদাতা মশীহ বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন। এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। একটি গভীর বিশ্বাসের তত্ত্ব সাধু পিতর এখানে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে পিতর পিতা ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনাকেই প্রকাশ করেছেন; যীশুর প্রতি তার গভীর বিশ্বাসকেই স্বীকার করেছেন। এর মধ্য দিয়েই যীশুর সত্য পরিচয়কেই তিনি প্রকাশ করেছেন।

পিতরের উত্তরে যীশু খুশি হয়েছিলেন। তিনি পিতরকে ধন্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আশীর্বাদিত করেছেন। তিনি পিতরকে পাথর বলে সম্বোধন করে তাঁর নামের যথার্থতা প্রকাশ করেছেন। পিতরকেই তিনি প্রধান হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং বলেছেন, "তুমি পাথর, আর এই পাথরের উপরই আমি আমার মন্ডলী স্থাপন করব। আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব, পৃথিবীতে যা তুমি বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে আর পৃথিবীতে যা তুমি ছেড়ে দিবে, স্বর্গেও তা ছেড়ে দেওয়াই হবে।" (মথি ১৬:১৭-২০)।

যীশু সাধু পিতরের হাতে স্বর্গরাজ্যের চাবি তুলে দিচ্ছেন

পিতরের বিশ্বাসকে আরও খাঁটি করার জন্য যীশু একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "পিতর, তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" যীশু পিতরকে তিনবার একই প্রশ্ন করেছিলেন। আর তিনবারই এই প্রশ্নের উত্তরে পিতর বলেছিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, আমি আপনাকে ভালোবাসি।" প্রত্যুত্তরে যীশু পিতরকে বলেছিলেন, "তুমি আমার মেষদের দেখাশুনা কর।" (যোহন ২১:১৫-১৭)।

এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যীশু পিতরকে ধীরে ধীরে প্রস্তু ত করেছেন যেন তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। পিতরের উপর এক বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যীশুর প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বাস স্বীকারের জন্যই যীশু পিতরকে এই মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। "আমার মেষদের দেখাশুনা কর"–এটা একটি বড় দায়িত্ব যা পিতরের উপর অর্পিত হয়েছিল।

পিতর হয়ে উঠেছেন শিষ্যদলের প্রধান এবং মণ্ডলীর নেতা। পিতর ছিলেন মণ্ডলীর প্রথম পোপ। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে দেওয়া হয়েছে। পিতর যীশুর অনেক ঘটনার সাক্ষী। যেখানে সকল শিষ্য যেতে পারেননি সেখানে পিতর ও মাত্র অন্য দুই জন শিষ্য যীশুর সাথে ছিলেন। যেমন পর্বতের উপর যীশুর দিব্য রূপান্তর এবং

গেৎসিমানি বাগানে যীশুর মর্মবেদনার সময় পিতর, যাকোব ও যোহনকে যীশু সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পিতর ছিলেন একজন সুবক্তা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পিতরই এগিয়ে গিয়েছেন ও শিষ্যদের একজন হয়ে কথা বলেছেন। অনেক সময় যীশুর বিভিন্ন প্রশ্নে পিতরই জবাব দিয়েছেন। কয়েক ক্ষেত্রে পিতর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। ফলে তাঁর বিশ্বাসের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। জলের উপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তিনি ডুবে যাচ্ছিলেন। যীশু শিষ্যদের পা ধুয়ে দেওয়ার সময় পিতর বাধা দিয়েছিলেন। গেৎসিমানি বাগানে যীশুকে গ্রেফতার করার সময় পিতর তরবারি দিয়ে একজন সৈন্যের কান কেটে ফেলেছিলেন। মৃত্যুভয়ে সামান্য এক দাসীর কাছে পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পিতরের বিশ্বাস দুর্বল ছিল। একবার যীশু জলের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। পিতর বললেন, আমাকেও অনুমতি দিন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে। যীশু তাঁকে আসতে বললেন। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে পিতর ডুবে যেতে লাগলেন। যীশু তখন তাঁকে বললেন, "এত অল্প তোমার বিশ্বাস? কেনই বা সন্দেহ করলে তুমি?" (মথি ১৪:৩১)। বিশ্বাসের দুর্বলতায় যীশু তাঁকে গঠন দিয়েছেন। শক্তি ও সাহস দিয়েছেন যার ফলে পঞ্চাশত্তমী দিনে এই পিতরই সাহসের সাথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়েছেন এবং ফরিসিদের অভিযুক্ত করেছেন। পিতরের বক্তব্য শুনে সেদিন পাঁচ হাজার মানুষ দীক্ষা নিয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হয়েছিলেন। পিতর মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে বিশ্বাসকে ধরে রেখেছেন এবং আমৃত্যু যীশুর কথা প্রচার করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করে মণ্ডলীর ভিত্তি হয়ে উঠেছেন।

কাজ : সাধু পিতর কোথায় কোথায় বাণী প্রচার করেছেন বাইবেল থেকে তার একটি তালিকা প্রস্তু ত কর।

পাঠ ৩ : পুনরুত্থানের সাক্ষী সাধু পিতর

সাধু পিতর যে শুধু মণ্ডলীর ভিত্তি হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, তিনি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রথম সাক্ষীও। সাধু যোহন তাঁর লিখিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণনা করেছেন, সাধু পিতর যীশুর শূন্য কবরে প্রথম প্রবেশ করেছেন (যোহন ২০:১-৯)। যদিও যীশুর প্রিয় শিষ্য যোহন শূন্য কবর আগেই দেখেছেন তবে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেননি। মণ্ডলীর প্রধান ও ভিত্তি হিসেবে তিনি পিতরের জন্য অপেক্ষা করেছেন এবং পিতরকে আগে ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন।

যীশুর পুনরুত্থানের পর বেশ কয়েকবার যীশু শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন এবং যীশুর সব দর্শনেই পিতর উপস্থিত ছিলেন। যীশু যে তার পুনরুত্থানের কথা মৃত্যুর পূর্বে বলে গেছেন পিতর বুঝতে পেরেছেন, তা সত্যি হয়েছে। পিতর বিশ্বাস করেছিলেন যে যীশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন।

সাধু পল তার বিভিন্ন পত্রে যীশুর পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেছেন। সবখানেই তিনি প্রকাশ করেছেন যে যীশু সর্বপ্রথমে পিতরকে দেখা দিয়েছেন এবং পরে অন্যান্য শিষ্য ও আরও অনেক মানুষকে দেখা দিয়েছেন। সাধু যোহন তাঁর লিখিত মঙ্গলসমাচারের শেষ অধ্যায়ে পিতরের সাথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সুন্দর একটি সংলাপ তুলে ধরেন।

পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন। তিনবার অস্বীকারের বিপরীতে পিতর তিনবার যীশুকে

'ভালোবাসি' বলে স্বীকার করেছেন। আর যীশু পিতরকে তিনবার স্মরণ করিয়ে দেন, "আমার মেষদের দেখাশুনা কর।" মন্ডলীর প্রধান হিসেবে পিতরের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো যীশু পুনরায় পিতরকে স্মরণ করিয়ে দেন।

পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আদেশ পিতর জীবন দিয়ে পালন করেছেন। তিনি মন্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যুদা ইস্কারিয়তের স্থানে মাথিয়াসকে বেছে নেওয়ার নির্বাচন পরিচালনা করেন। আদি খ্রিস্টমন্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে শিষ্যগণ খাবার বিতরণে অনেক সময় দিচ্ছিলেন। এদিকে তাঁদের বাণী প্রচারে বিঘ্ন ঘটছিল। তাই পিতরের নেতৃত্বে শিষ্যগণ সামাজিক কাজের জন্য সাত জন ডিকনকে বেছে নেন। বিভিন্ন ঘটনায় পিতর শিষ্যদের মুখপাত্র হয়ে বক্তব্য রাখেন। যেমন, পবিত্র আত্মার অবতরণের দিন পিতরই ইহুদি জনতার কাছে প্রথম বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। তখন তাঁর কোনো ভয়ভীতি ছিল না। কিছু কিছু বিষয় নিয়ে শিষ্যদের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে পিতর তা মীমাংসা করেছেন। পুনরুত্থানের কথা প্রচার করতে গিয়ে পিতর কারাবরণ করেছেন। তবে তাঁর বিশ্বাসের ফলে তিনি আশ্চর্যভাবে কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নামে সাধু পিতর অনেক আশ্চর্য কাজও করেছেন। একবার মন্দিরে প্রবেশের আগে মন্দির-দ্বারে এক খোঁড়া ভিক্ষুক পিতরের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিতর বললেন, সোনা বা রুপা কিছুই নেই আমার, তবে আমার যা আছে, তোমাকে তা-ই দিচ্ছি। আমি নাজারেথের যীশুর খ্রিস্টের নামে বলছি, হেঁটে বেড়াও। আর তখনই খোঁড়াটি সুস্থ হয়ে গেল।

যে পিতর ক্ষুদ্র বিশ্বাসী ছিলেন, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে তিনি সাহসের সাথে বক্তব্য দিয়েছেন এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কথা প্রচার করেছেন। তাঁর বক্তব্যে বিশ্বাসী হয়ে তিন হাজার মানুষ সেদিন দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি গোটা মন্ডলীর প্রধান হিসেবে বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি সুদূর রোম পর্যন্ত তিনি প্রচার করেছেন। শেষে সাধু পিতর ক্রুশের উপর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। গুরুর পথ অনুসরণ করে সাধু পিতর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে বেছে নেন এবং বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেন।

কাজ : পিতরের জীবনের কোন দিকগুলো তোমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দান করে তা দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. সাধু পিতর ছিলেন ... মধ্যে প্রধান।

২. পিতরকে যীশু দৈনন্দিন ... থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের সেবা কাজে নিয়োজিত করলেন।

৩. পিতর ছিলেন একজন ...।

৪. পিতরের বক্তব্য শুনে ... মানুষ দীক্ষা নিয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

৫. পিতর ছিলেন মন্ডলীর ... পোপ।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যীশুর মুখের কথা, চোখের দৃষ্টি	• শিষ্যদলের প্রধান
২. যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতর হয়ে ওঠেন	• পুনরুত্থানের কথা প্রচার করেছেন
৩. পিতর মন্ডলীর প্রধান হিসেবে	• পিতরের মন আকর্ষণ করেছিল
৪. পিতর যীশুকে	• বিশ্বাসকে ধরে রেখেছেন
৫. সাধু পল তার বিভিন্ন পত্রে	• তিনবার অস্বীকার করেছিলেন
	• ভালোবাসি বলে স্বীকার করেছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যীশু তাঁর প্রচার কাজে সঙ্গী হিসেবে কয়জনকে বেছে নিয়েছিলেন?

ক. তিন জন   খ. চার জন

গ. দশ জন   ঘ. বারো জন

২. 'নৌকাটি এবার গভীর জলে নিয়ে যাও' কথাটি দ্বারা বোঝায়–

ক. আধ্যাত্মিক আহ্বান

খ. দক্ষ জেলে হবার আহ্বান

গ. বাধ্য হবার আহ্বান

ঘ. নম্র হবার আহ্বান

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মানিকের বাবা অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই তিনি তার চার সন্তানকে ডেকে সমস্ত সম্পত্তি ও দায়িত্ব কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। বড় ছেলে মানিককে ডেকে তিনি সব ভাইদের দেখেশুনে রাখতে বললেন এবং বিপদে আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। কারণ তিনি দেখেছেন মানিকের মায়ের মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারকে মানিক কীভাবে সান্ত্বনা দান করেছিল। কাজেই পরিবারের যেকোনো সমস্যায় মানিক এগিয়ে আসবে এ ব্যাপারে তার বাবা নিশ্চিত।

৩. পিতরের কোন গুণটি মানিকের মধ্যে ফুটে উঠেছে?

i. দায়িত্ববোধ

ii. নির্ভরশীলতা

ii. বিশ্বস্ত তা

৪. মানিকের দায়িত্ব নেওয়ার ফল কী হতে পারে?

ক. সম্পর্কের উন্নতি খ. নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি

গ. মনোবল বৃদ্ধি ঘ. নৈতিকভাবে বলীয়ান।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **উদ্দীপক-১ :** প্রদীপ একজন পুরোহিত। গ্রামের লোকেরা তাঁর কথা খুবই আগ্রহের সাথে শোনে ও কাজে লাগায়। গ্রামের বিপথগামী লোকেরা পুরোহিতের কথা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে যীশুর পথে ফিরে আসে।

উদ্দীপক-২ : সমীর একজন ব্যবসায়ী। দীর্ঘদিন ধরে কঠিন রোগে ভুগছে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোনো সুফল পায়নি। অবশেষে পুরোহিতের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলার পর পুরোহিত তাকে বললেন, 'ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখলে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।' তখন সমীর বলল, 'অনেকদিন ধরেই তে প্রার্থনা করছি, কিন্তু ফল পাচ্ছি না।'

ক. পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে শিষ্যদের উপর কী নেমে এসেছিল?

খ. সাধু পিতর কেন ক্রুশের উপর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন?

গ. সমীরের মধ্যে পিতরের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রদীপ ও সমীর দু'জনের মধ্যেই কী পিতরের চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও।

২. জীবন একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সে খুব একটা উন্নতি করতে পারছিল না। একদিন গির্জায় গিয়ে পুরোহিতের কাছে সব খুলে বলল। পুরোহিত তাকে কিছু পরামর্শ দিলেন। পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে কাজ করে সে ভালো ফলাফল পেল। এরপর থেকে সে নিয়মিত গির্জায় যেত, প্রার্থনায় অংশ্রহণ করত। বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে এগিয়ে আসত, সাহায্য সহযোগিতা করত। তার এরূপ আচরণ দেখে পুরোহিত তাকে যীশুর কথা প্রচার করতে আহ্বান করলেন। জীবন পুরোহিতের আহ্বানে সাড়া দিল।

ক. শিমন পিতরের পিতার নাম কী ছিল?

খ. প্রেরিত শিষ্য বলতে কী বুঝ?

গ. জীবনের মধ্যে যীশুর কোন শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'জীবন যেন পিতরেরই প্রতিচ্ছবি'– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রেরিত শিষ্য বলতে কী বুঝ?

২. পিতর কীভাবে আশ্চর্য কাজ করতেন?

৩. পিতর কীভাবে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কথা প্রচার করেছেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়াদানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

২. পিতরের বক্তব্য ও বক্তব্যের ফলাফল বর্ণনা কর।

৩. 'পুনরুত্থানের সাক্ষী সাধু পিতর'– কথাটি বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

খ্রিষ্টমণ্ডলী

পূর্বে আমরা খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে জেনেছি যে খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো খ্রিষ্টের মণ্ডলী। খ্রিষ্টকে কেন্দ্র করে খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভক্তগণ একত্রে ভালোবাসার মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। খ্রিষ্টমণ্ডলী হলো খ্রিষ্টের সাথে মানুষের অন্তরঙ্গভাবে মিলনের প্রকাশ। এই অধ্যায়ে খ্রিষ্টের সাথে খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিরাজমান ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি সম্পর্কে জানব। এ বিষয়ে জানার জন্য আমরা মানবদেহের মস্ত ক ও অন্যান্য অংশের তুলনার মাধ্যমে খ্রিষ্টের মস্ত কের সাথে দেহের সম্পর্ক জানার চেষ্টা করব। আমরা কীভাবে এই মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠতে পারি তা নিয়েও আমরা আলোচনা করব।

খ্রিষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্ত ক। আমরা হলাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- খ্রিষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর বর্ণনা দিতে পারব;
- খ্রিষমণ্ডলীর মস্ত ক হিসাবে খ্রিষ্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- খ্রিষ্টদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবে খ্রিষ্টভক্তদের ভূমিকা বিশেষণ করতে পারব;
- মণ্ডলীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবো।

পাঠ ১ : খ্রিস্টমণ্ডলী একটি দেহ

আমাদের নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশি জ্ঞান আছে। মানুষ হিসাবে আমাদের দেহ একটি। ঈশ্বর কত সুন্দর করেই না আমাদের এই দেহকে সৃষ্টি করেছেন! যে অংশটি যেখানে থাকার কথা তা তিনি সেখানে সুন্দর করে স্থাপন করে দিয়েছেন। আমাদের এই দেহ একটি, কিন্তু এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক। সব অঙ্গই দেহের সাথে যুক্ত রয়েছে।

> **কাজ :** খ্রিস্টমণ্ডলীকে বুঝানোর জন্য সবাই নিজ নিজ খাতায় একটি মানবদেহের ছবি অঙ্কন কর। তুমি মণ্ডলীর কোন অঙ্গটি হতে চাও এবং তা হয়ে কী কাজ করতে চাও তা লেখ।

খ্রিস্টের দেহ

খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টেরই দেহ। যারা প্রভুর বাণীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে সংযুক্ত হয় তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁর সাথে মিলিত হয়। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের দেহ-মন-আত্মায় খ্রিস্টের জীবন সঞ্চারিত হয়। পবিত্র সংস্কারগুলোর দ্বারা খ্রিস্টের যাতনাভোগ এবং মহিমার সঙ্গে খ্রিস্টমণ্ডলীর অদৃশ্য অথচ বাস্ত ব সংযোগ ঘটে। দীক্ষাস্নান সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টের দেহকে বাস্ত বে গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে খ্রিস্টমণ্ডলী খ্রিস্টের সাথে ও একে অপরের সাথে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যীশু বলেছেন, যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।

দেহরূপ খ্রিস্টের সাথে খ্রিস্টমণ্ডলীর এই একতা ভক্তদের অন্তরে ভ্রাতৃপ্রেম সৃষ্টি করে এবং এই প্রেমের বা একতার বন্ধনে জীবন যাপন করতে সবাইকে উদ্দীপিত করে। সাধু পল এই একতাকে মানব দেহের সাথে তুলনা করে বলেছেন আমাদের দেহ এক অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলো অনেক হয়েও সবকটি মিলে এক দেহই হয়। তেমনি আমরা একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি। তাই আমাদের উৎস এক। আমরা খ্রিস্টেতে এক। সেই কারণে তিনি বলেছেন, "আমি যেমন তোমাদের অন্তরে রয়েছি, তেমনি তোমরা আমাতে থাক। আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, তোমরা হলে শাখাপ্রশাখা।" (যোহন ১৫:৪-৫)।

> **কাজ :** মাথা দিয়ে আমরা যে সব কাজ করি দলে তার একটি তালিকা প্রস্তু ত কর ও পরে প্রত্যেক দল থেকে একজন প্রতিবেদন পেশ কর। প্রতিবেদন থেকে যে কাজের নামগুলো উঠে আসবে সেগুলো একটি পোস্টারে লিখে ঝুলিয়ে রাখ।

পাঠ ২ : দেহের মস্ত ক খ্রিষ্ট

সব কিছুর মধ্যে একটি প্রধান বা প্রথম অংশ থাকে। তা সংখ্যার দিক থেকে হতে পারে। আবার গুরুত্ব বা ভূমিকার দিক থেকেও হতে পারে। একটি পরিবারের প্রধান বা কর্তা হলেন পিতা বা মাতা। পরিবারের প্রধান বা মস্ত ক হিসাবে তার ভূমিকা অনেক। মানব দেহের প্রধান অংশ হলো মস্ত ক। মাথা মানব দেহের জন্য কত কাজ যে করে থাকে তা বলে শেষ করা যাবে না।

খ্রিষ্ট হলেন মণ্ডলীর মস্ত ক

মণ্ডলীর মস্ত ক খ্রিষ্ট

খ্রিষ্টমণ্ডলীতে প্রভু যীশু খ্রিষ্ট হলেন মস্ত কস্বরূপ। পিতার সাথে সংযুক্ত থেকে পিতার গৌরবে তিনি সব কিছুর শীর্ষে রয়েছেন। পিতার মধ্য দিয়ে তিনি সব কিছুর উপর তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। খ্রিষ্ট তাঁর নিস্ত ার রহস্যে আমাদেরকে একত্রিত করেন। এই কারণে আমরা তাঁর জীবন রহস্যে প্রবেশ করি। মস্ত করূপ খ্রিষ্টের সাথে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর কষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমরা তাঁর কষ্টের সহভাগী হয়েছি যেন তাঁর গৌরবেও গৌরবান্বিত হতে পারি।

মস্ত করূপ খ্রিষ্টের সাথে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে আমরা বৃদ্ধি লাভ করি। সেই কারণে তিনি তাঁর দেহরূপ মণ্ডলীকে বিভিন্ন দান ও সহায়তা দিয়ে থাকেন। তাঁর সহায়তা লাভের মধ্য দিয়ে আমরা পরিত্রাণ লাভের পথে এগিয়ে যাই। একে অন্যের সাহায্য করে থাকি। এভাবে মস্ত করূপ খ্রিষ্ট ও দেহরূপ মণ্ডলী মিলে গড়ে তোলে পরিপূর্ণ খ্রিষ্টকে।

কাজ : দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা মস্ত কের কাজগুলোর সাথে মণ্ডলীর মস্ত ক খ্রিষ্টের একটি সম্পর্ক দেখাও।

পাঠ ৩ : দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

আমাদের মানব দেহে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। সাধু পল বলেন আমাদের দেহ কেবল মাত্র একটি অঙ্গ নিয়ে নয়। দেহের মধ্যে অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। মানব দেহের এই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর কাজও বিভিন্ন রকম। ঈশ্বর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে এক জায়গায় বসিয়ে দেননি। তাঁর পছন্দমতো অঙ্গগুলোকে বিভিন্ন উপযুক্ত ও ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক অঙ্গের গুরুত্বের দিক দিয়েও একটি থেকে অন্যটি কম নয়। একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গকে বলতে পারে না তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সবাই কষ্ট ভোগ করে। অন্য দিকে একটি অঙ্গ যদি সমাদর বা আনন্দ পায় তাহলে অন্যগুলোও আনন্দে আনন্দিত হয়।

কাজ : দেহের চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদি দিয়ে আমরা কী কী কাজ করি দলে তার একটি তালিকা প্রস্তু ত কর ও পরে প্রত্যেক দল থেকে একজন করে তার প্রতিবেদন পেশ কর। প্রতিবেদন থেকে যে কাজের নামগুলো উঠে আসবে সেগুলো একটা পোস্টারে লিখে শ্রেণি কক্ষে ঝুলিয়ে রাখ।

মণ্ডলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

মানব দেহের মতো খ্রিস্টমণ্ডলী একটি দেহ এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক খ্রিস্টভক্ত এক একটি অঙ্গ। সাধু পল বলেন, পরমেশ্বর মণ্ডলীতে যাদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথমে আছেন প্রেরিত দূতেরা, তারপর প্রবক্তারা, তারপর শিক্ষাগুরুরা; তারপর রয়েছেন তারাই–যাদের তিনি দিয়েছেন অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা বা রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কিংবা পরকে সাহায্য করার বিশেষ গুণ বা তাদের পরিচালনা করার বিশেষ ক্ষমতা অথবা নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, অন্য কাউকে আবার সেই ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। সুতরাং দেখা যায়, ঈশ্বর মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দান দিয়ে এই জগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি চান মানুষ যেন তাদের দানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে ও দান অনুসারে কাজ করে। যাকে ঈশ্বর যে দান দিয়েছেন বা যাকে যে কাজের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন সেই কাজ প্রত্যেকেরই সুন্দরভাবে করতে হবে।

কাজ : দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির কাজগুলোর সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্ক দেখাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. খ্রিস্টমণ্ডলী হলো খ্রিস্টের সাথে মানুষের ... মিলনের প্রকাশ।

২. আমাদের দেহ একটি কিন্তু এর ... অনেক।

৩. দীক্ষাস্নান সংস্কারের মধ্য দিয়ে ... খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়।

৪. তেমনি আমরা একই পবিত্র আত্মার শক্তিতে সকলেই ... হয়ে একই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি।

৫. তাই আমাদের ... এক।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর কত সুন্দর করেই না	• খ্রিস্টেরই দেহ
২. সব অঙ্গাই দেহের	• অংশ হলো মস্ত ক
৩. একটি পরিবারের প্রধান বা কর্তা	• কেবলমাত্র একটি অঙ্গা নিয়ে নয়
৪. মানব দেহের প্রধান	• আমাদের এই দেহকে সৃষ্টি করেছেন
৫. সাধু পল বলেন আমাদের দেহ	• হলেন পিতা বা মাতা
	• সাথে যুক্ত রয়েছে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ্রিষ্টমণ্ডলী কী?

ক. খ্রিষ্টের দেহ খ. ত্রিত্বের আত্মা

গ. খ্রিষ্টভক্তের গৃহ ঘ. পালকীয় কেন্দ্র

২. কোন সংস্কারের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়ে ওঠে?

ক. দীক্ষাস্নান খ. বিবাহ

গ. যাজকাবরণ ঘ. রোগীলেপন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সোমার বাবা-মা দু'জনেই চাকরিজীবী। বাবা বিভিন্ন সংঘ, সমিতির সাথে জড়িত, গির্জার বিভিন্ন কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করেন। এ সকল কারণে পরিবারেও যে কোনো ব্যাপারে বাবার সিদ্ধান্ত ও মতামতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

৩. সোমার বাবার ভূমিকার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?

ক. খ্রিষ্টের ভূমিকা খ. পরিবারের অবদান

গ. পুরোহিতদের ভূমিকা ঘ. মণ্ডলীর অবদান

৪. সোমার বাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে পরিবারের প্রত্যেকে লাভ করে–

i. সমৃদ্ধি

ii. পরিত্রাণ

iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. স্কুলের প্রধান শিক্ষক তার সব শিক্ষকের কর্মদক্ষতা মেধা, সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত। বিদ্যালয়ের সকল কাজে যার যার দক্ষতা অনুযায়ী তিনি সকলের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। কখনো দেখা যায় দু'একজনকে তিনি একাধিক দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ অসন্তুষ্ট হন এবং প্রধান শিক্ষককে বলেন, 'অন্যদের কেন কম দায়িত্ব দেওয়া হয়, তারাও তো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক।' প্রধান শিক্ষক বললেন, 'বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেকেই এই পরিবারের সদস্য। পরিবারে সকলে এক কাজ করে না। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই পরিবারে প্রত্যেকের গুরুত্ব সমান।'

১. খ্রিষ্টমণ্ডলীতে কাকে মস্ত কস্বরূপ চিহ্নিত করা হয়?

২. 'আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, তোমরা হলে শাখা-প্রশাখা'– উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩. শিক্ষকদের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টমণ্ডলীর কী প্রকাশ পেয়েছে?

৪. 'উদ্দীপকের শিক্ষকগণ যেন মণ্ডলীর এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'– উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খ্রিষ্টমণ্ডলী বলতে কী বুঝ?

২. খ্রিষ্ট কেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্ত ক?

৩. কীভাবে খ্রিষ্টমণ্ডলী খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্ত ক হিসেবে খ্রিষ্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

২. খ্রিষ্টদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসেবে খ্রিষ্টভক্তদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩. মণ্ডলীর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কীভাবে আগ্রহী হবে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

যীশুর আশ্চর্য কাজ ও ঐশরাজ্য

প্রভু যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে আমরা জানি। আশ্চর্য কাজগুলোর একটা তালিকাও আমরা দেখেছি। আমরা আরও জানি, প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাঁর আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে এই জগতের মধ্যে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা ঐশরাজ্য সম্পর্কে আরও একটু গভীর জ্ঞান লাভ করব এবং ঐশরাজ্য বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করব।

কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে যীশুর প্রথম আশ্চর্য কাজ

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ঐশরাজ্যের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- যীশুর উপমা কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- মথি ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ে বর্ণিত আশ্চর্য কাজগুলোর মাধ্যমে ঐশরাজ্য বিস্তারে সক্রিয় হওয়ার জন্য যীশু লোকদের আহ্বান করেন, এ বিষয়ে বর্ণনা করতে পারব;
- ঐশরাজ্য বিস্তারে যীশুর ডাকে সাড়া দিব।

পাঠ ১ : ঐশরাজ্য

আমরা বিভিন্ন রাজা ও রানির অনেক গল্প শুনেছি ও বই পুস্ত কের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ও রাজ্য সম্পর্কে জেনেছি। যে কোনো রাজারই একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা ভূখণ্ড এবং প্রজা, মন্ত্রীবর্গ ও সৈন্যসামন্ত থাকে। রাজা সবসময় তার রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য কাজ করেন এবং পাশাপাশি প্রজারা কীভাবে সুখশান্তি ও আনন্দে বসবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থা করেন। গোটা রাজ্যের শাসন ক্ষমতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে রাজার উপর। অন্যদিকে রাজ্যকে সুন্দর ও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রজা সাধারণের আনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে।

যীশু খ্রিষ্ট এই জগতে এসেছেন এমন একটি সুন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে থাকবে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহভাগিতা এবং এরকম আরও বিশেষ বিশেষ গুণ। ঈশ্বর সকল মানুষকে ভালোবাসেন। তাই তিনি তাঁর পুত্র যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে এই জগতে সেই প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যীশু খ্রিষ্ট এই জগতে এসেছেন পিতার ইচ্ছা পালন করতে। তিনি চেয়েছেন, তাঁর সেবার জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে।

জাগতিক রাজ্য ও ঐশরাজ্যের মধ্যে পার্থক্য

প্রথমে আমরা জাগতিক রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং পরে ঐশরাজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব। দুই ধরনের রাজ্যের মধ্যে আমরা একটা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারব।

জাগতিক রাজ্য

জাগতিক রাজ্য বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড বা একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে বুঝে থাকি। এই ভূখন্ডের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছু এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। জাগতিক রাজ্যের মধ্যে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা ইত্যাদি গুণগুলো রয়েছে। তবে এগুলোর পাশাপাশি রয়েছে ক্ষমতার দাপট, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ইত্যাদি নেতিবাচক দিকসমূহ। ভালো ও মন্দ নিয়েই আমাদের এই জগতের রাজ্য বা জাগতিক রাজ্য।

ঐশরাজ্য

ঐশরাজ্য হলো ঈশ্বরের রাজ্য। ঈশ্বর মানুষের জন্য যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেটি হলো ঐশরাজ্য। ঈশ্বর এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে। ঐশরাজ্য এই জগতের রাজ্যের মতো সীমানা দিয়ে পরিবেষ্টিত কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নয়। এটি হলো ভালোবাসা, আনন্দ, ন্যায্যতা, শান্তি, ক্ষমা, সহভাগিতা ও সহযোগিতার রাজ্য। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেছেন এই বলে যে, ঐশরাজ্য খুব কাছে এসে গেছে। তাই তিনি সকলকে মন পরিবর্তন ও মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করতে আহ্বান করেছেন। যীশু খ্রিস্ট নিজেই ঐশরাজ্যের মূর্ত প্রতীক স্বরূপ। যীশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়েই ঐশরাজ্যের পূর্ণ প্রকাশ। প্রভু যীশু তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে ঐশরাজ্যে প্রবেশের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি যে শুধু বাণীর মধ্য দিয়ে পথ নির্দেশ দিয়েছেন তা নয়, তিনি নিজেই সেইভাবে জীবন যাপন করেছেন এবং আমাদেরকে সেইরূপ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কাজ : কে কীভাবে ঐশরাজ্যের জন্য কাজ করতে পার তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা কর।

পাঠ ২ : যীশুর উপমা কাহিনী

কোনো কোনো বিষয় রয়েছে যা ভাষায় পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা যায় না। আর তখনই উপমা বা রূপকের ব্যবহার করা হয়। যেমন, পৃথিবীর আকার বর্ণনা দিয়ে সম্পূর্ণ বুঝানো যায় না বলে রূপকের মাধ্যমে বলা হয় যে, পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল। স্বর্গীয় পিতার অসীম ক্ষমাশীলতা বুঝাবার জন্য যীশু হারানো ছেলের উপমা দিয়েছেন। উপমা বা রূপক ব্যবহারে যদিও ঐ বিষয়টির পরোপুরিভাবে বুঝানো সম্ভব হয় না তথাপি ঐ বিষয়বস্তু র খুব কাছাকাছি যাওয়া বা ধারণা দেওয়া সম্ভব হয়।

ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য যীশু খ্রিস্টের আমন্ত্রণ আসে উপমা বা রূপকের মধ্য দিয়ে, যা তাঁর শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাঁর প্রচার কাজে ঐশরাজ্যকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য বিভিন্ন রূপক বা উপমা ব্যবহার করেন। উপমার মধ্য দিয়ে লোকদের ঐশরাজ্যের ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেও পাশাপাশি একটি মূল সিদ্ধান্ত নিতেও আহ্বান করেন। ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে জাগতিক বিষয়সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, ভোগবিলাসিতা ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে হবে।

বিভিন্ন রূপক বা উপমা কাহিনী

যীশু খ্রিস্টের রূপক বা উপমা কাহিনীগুলো আমাদের জন্য দর্পণ বা আয়নার মতো। এগুলো আমাদের জীবনের কথা বলে। প্রভু যীশু ঐশরাজ্যের মর্মসত্য প্রকাশ করার জন্য অনেক উপমা বা রূপক ব্যবহার করেছেন।

শ্যামা ঘাস ও গমের দানার উপমা

তিনি ঐশরাজ্যকে জমিতে বোনা গমের গাছ ও শ্যামা ঘাসের সাথে তুলনা করেছেন। একজন চাষি জমিতে গমের দানা বুনেছে। কিন্তু সকলে যখন ঘুমাচ্ছিল তখন শত্রু এসে গমের ক্ষেতে শ্যামা ঘাসের বীজ বুনে দিয়েছিল। গমের গাছ ও শ্যামা ঘাস দেখতে একই রকম হওয়ায় দুই-ই এক সাথে বাড়তে লাগল। যখন গমের শিষ বের হতে শুরু করল তখন শ্যামা ঘাসগুলো ধরা পড়ল। তাই কর্মচারীরা এসে মনিবকে এই বিষয়ে জানাল। তারা শ্যামা ঘাসগুলো তুলে ফেলার অনুমতি চাইল। কিন্তু মনিব অনুমতি দিলেন না। তিনি দুইটাকেই একসাথে বাড়তে দিতে বললেন। কারণ মনিবের ভয় ছিল যদি কর্মচারীরা শ্যামা ঘাস তুলতে গিয়ে গমের গাছগুলোও তুলে ফেলে, তাহলে গমের ক্ষতি হবে। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তিনি তাদের অপেক্ষা করতে বললেন। ফসল কাটার সময় এলে তিনি ফসল কাটিয়েদের বলে দিলেন আগে শ্যামা ঘাসগুলো তুলে এনে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে ও পরে গম তুলে এনে গোলাঘরে সঞ্চয় করতে।

শর্ষে বীজের রূপক

স্বর্গরাজ্য বা ঐশরাজ্য বুঝাতে প্রভু যীশু শর্ষে বীজের উপমা ব্যবহার করেছেন। একজন চাষি তা একদিন নিজের জমিতে বুনে দিল। বীজ হিসাবে শর্ষে বীজ অন্যান্য বীজের চেয়ে ছোট। কিন্তু তার চারাটি অন্যান্য গুল্মের চেয়ে বড়ই হয়। আর শেষে তা হয়ে ওঠে একটি পরিণত চারা গাছ। আকাশের পাখিরাও তাতে বাসা বাঁধতে পারে।

খামিরের উপমা

যীশু ঐশরাজ্য বুঝাতে খামিরের উপমা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, ঐশরাজ্য যেন সেই খামিরেরই মতো। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে এসে তিন পাল্লা ময়দার সাথে মাখতে লাগল, যতক্ষণ না সমস্ত টাই গেঁজে ওঠে।

গুপ্তধন ও মণিমুক্তার উপমা

যীশু বললেন, ঐশরাজ্য যেন কোনো জমিতে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের মতো। একটি লোক তা খুঁজে পেয়ে সেখানেই আবার তা লুকিয়ে রাখল। তারপর মনের আনন্দে গিয়ে তার যা কিছু ছিল সমস্ত ই বেচে দিয়ে সেই জমিটা কিনে ফেলল।

আবার স্বর্গরাজ্য যেন দামি মুক্তারই মতো। একজন বণিক দামি মুক্তার খুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই বণিক একটি মহামূল্যবান মুক্তার খোঁজ পেতে না পেতেই সোজা গিয়ে তার যা-কিছু ছিল সমস্ত ই বেচে দিয়ে মুক্তাটি কিনে ফেলল।

জাল ভর্তি মাছের উপমা

প্রভু যীশু ঐশরাজ্যের তুলনা দিয়েছেন একটি জালের সাথে। একটি জাল সমুদ্রে ফেলা হলো এবং তাতে সব ধরনের মাছ ধরা পড়ল। জালটি ভর্তি হলে জেলেরা তা ডাঙায় টেনে তুলল আর সেখানে ভালো ভালো মাছগুলো বেছে ঝুড়িতে রাখলো আর বাজে মাছগুলো সমুদ্রে ফেলে দিল।

কাজ : বাস্ত ব জগতে ঐশরাজ্যের কী কী চিহ্ন দেখা যায় দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটা তালিকা তৈরি করে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ৩ : ঐশরাজ্যের কর্মী

প্রতিটি সক্ষম মানুষেরই কোনো না কোনো কাজ করে জীবন ধারণ করতে হয়। যেমন সাধু পল বলেন, সবাই যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম করে আর এইভাবে নিজদের অন্ন সংস্থান নিজেরাই করে নেয় (দ্রষ্টব্য ২ থেসা ৩:১২)। প্রভু যীশু শিষ্যদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, "যে কর্মী, তার মজুরি পাবার অধিকার তো আছেই।" (লুক ১০:৭)। কাজেই যে কাজ করে, সেই কর্মী। এই হিসাবে আমরা যারা নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করি, তারা সকলেই কর্মী। ঈশ্বর মানুষকে এই জগতে পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে। সেই কারণে একেক জন মানুষ একেক কাজ করে জীবন ধারণ করে। আমরা কোনো কোনো কাজ এই জগতে জীবন ধারণের জন্য করি আবার কোনো কোনো কাজ পরজগতের জন্য করি। কোনোটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে করি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্য বিস্ত ারের জন্য করি।

ঐশরাজ্য বিস্ত ারের জন্য মণ্ডলীতে কর্মীর বড়ই অভাব। চারিদিকে লোকের ভিড় দেখে তাদের জন্য যীশুর দুঃখ হলো। তারা ক্লিষ্ট অবসন্ন, যেন পালকবিহীন মেষের মতো। তাদের দেখে তাঁর করুণা হলো। তিনি তাদের বললেন, "ফসল তো প্রচুর, কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই। তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও যেন তাঁর শস্যক্ষেত্রে কাজ করার লোক পাঠিয়ে দেন।" (মথি ৯:৩৭)।

কিন্তু ঐশরাজ্যে কাজ করার জন্য যীশুর আবেদন ভিন্ন। সবাই এই কাজের জন্য আহূত। কিন্তু মনোনীত হয় অল্পই। একবার একজন শাস্ত্রী কাছে এসে যীশুকে বলল, গুরু, আপনি যেখানেই যাবেন, আমি কিন্তু সেখানেই আপনার সঙ্গে যাব। যীশু তার কথার উত্তরে বললেন, শেয়ালের থাকবার গর্ত আছে, আকাশের পাখিরও বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার জায়গাটুকু নেই।" (মথি ৮:২০)। আবার অন্য একজন যীশুর কাছে এসে বলল, প্রভু অনুমতি দিন আমি আগে আমার বাবাকে সমাধি দিয়ে আসি। কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "না, তুমি বরং আমার সঙ্গেই চল। মৃতদের সমাধি দেওয়ার কাজটা মৃতদের হাতেই ছেড়ে দাও।" (মথি ৮:২১)।

যীশু করগ্রাহক মথিকে তাঁর পথ অনুসরণ করার কথা বলার সাথে সাথে মথি শুল্কদপ্তর থেকে যীশুর সঙ্গে চলেছেন। যীশু মথির বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। তা দেখে ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা শিষ্যদের কাছে যীশুর বিভিন্ন বিষয় বলাবলি করতে লাগল। যীশু তাদের প্রত্যুত্তরে বললেন, "সুস্থ সবল যারা তাদের তো চিকিৎসকের কোনো প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন হয় তাদেরই ব্যাধিগ্রস্ত যারা আসলে, আমি তো ধার্মিকদের নয়, পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি।" (মথি ৯: ১২-১৩)। কাজেই দেখা যায়, ঐশরাজ্যের কর্মী হওয়ার জন্য সকল মানুষ সমানভাবে আহূত ও মনোনীত। তবে যারা নিজেদেরকে ইতোমধ্যেই পবিত্র বলে মনে করে, ঐশরাজ্যে প্রবেশের মতো নম্রতা তাদের নেই।

কাজ : তুমি কীভাবে ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য যীশুর আহ্বান শুনতে পাও তা ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান করে খাতায় লেখ।

পাঠ ৪ : যীশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়া

আহ্বান অর্থ হলো ডাক। মানুষ মানুষকে শনাক্ত করার জন্য নাম রাখে। ঈশ্বর মানুষকে সেই নাম ধরেই ডাকেন। এক মানুষ আর এক মানুষকে ডাক দেয় তার দিকে মনোনিবেশ বা দৃষ্টি নিবন্ধ করার জন্য। আমরা কারও ডাক শুনে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করি। শুধু তাই নয় আমরা তার ডাকে সাড়া দিতেও চেষ্টা করি।

যীশু খ্রিস্ট তাঁর বাণী প্রচারের শুরুতে বারো জনের একটি দল গঠন করলেন। এই বারো জনের নাম তিনি দিলেন প্রেরিত দূত। প্রেরিত দূত কথাটির অর্থ হলো সেই দূত যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যীশু তাঁদের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন। আবার অনেকে তাঁর বাণী শুনে তাঁর অনুগামী হয়েছেন।

যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম শিষ্যরা তাঁদের সবকিছু ফেলে রেখে যীশুর অনুসরণ করেছেন। পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয়, যারা পেশায় জেলে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের একমাত্র সম্বল নৌকা, জাল, সঙ্গীদের ও তাদের পিতাদের রেখে যীশুর পিছু নিয়েছেন। করগ্রাহক মথি তাঁর এত দিনের পেশা, কর আদায় ছেড়ে দিয়ে যীশুকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন। শুধু যে বারো জন শিষ্যই যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন, তা নয়। তাঁর বাণী শোনার জন্য লোকেরা দলে দলে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে।

বারোজন প্রেরিত দূতকে মনোনয়ন

যীশু সারা রাত ধরে প্রার্থনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন সব শিষ্যদের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকজনকে মনোনয়ন দিতে। এরপর তিনি তাঁদের বেছে নিলেন। যে বারোজনকে তিনি বেছে নিলেন তাঁদের তিনি তাঁর কাছে

ডাকলেন। তাদেরকে তিনি রোগব্যাধি সারিয়ে তোলার ও অপবিত্র যত বিদেহী আত্মাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দিলেন। তাঁরা হলেন- সিমোন, যাঁকে পিতরও বলা হয়, আর তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদের ছেলে যাকোব আর যাকোবের ভাই যোহন, ফিলিপ আর বার্থলোমিয়, টমাস আর করগ্রাহক মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব আর থাদ্দেয়, উগ্রধর্মা সিমোন আর যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি পরে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

আমাদের আহ্বান

প্রথম শিষ্যদের ন্যায় প্রভু যীশু প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান করছেন। প্রথম শিষ্যদের ন্যায় আমাদের সবাইকেই সব কিছু ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে না। তিনি এই সময় আমাদের আহ্বান করেন তাঁর বাণী অনুসারে জীবন যাপন করতে, তাঁর দেখানো পথে চলতে। তবে তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা সহজ নয়। তাই তিনি বলেছেন- "কেউ আমাকে অনুসরণ করতে চাইলে তাকে আত্মত্যাগ করতে হবে এবং নিজের ক্রুশ বহন করে চলতে হবে"। তিনি আরও বলেছেন- "কেউ যদি আমার চেয়ে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের বেশি ভালোবাসে সে আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়।"

কাজ : তুমি কীভাবে তোমার ব্যক্তিগত আহ্বান উপলব্ধি করে যীশুকে অনুসরণ করবে তা লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. যীশু সেবার জীবন ও তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে ... ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

২. ঐশরাজ্য হলো ... রাজ্য।

৩. যীশু খ্রিস্টের রূপক বা উপমাগুলো আমাদের জন্য ...।

৪. ঈশ্বর মানুষকে এই জগতে পাঠিয়েছেন বিভিন্ন ... দিয়ে।

৫. প্রেরিত দূত কথাটির অর্থ হলো যাকে ... করা হয়েছে।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. আহ্বান অর্থ	• মথির বাড়িতে
২. ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য	• দিয়েছিলেন যুদা
৩. ভালো ও মন্দ নিয়েই	• নম্রতা প্রয়োজন
৪. যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে	• ঐশরাজ্য
৫. যীশু নিমন্ত্রণ খেয়েছেন	• ডাক
	• জাগতিক রাজ্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্যামা ঘাস কিসের প্রতীক?

ক. মন্দতার খ. দুর্বলতার

গ. অশান্তির ঘ. বিচ্ছেদের

২. কীভাবে ঐশরাজ্যে প্রবেশ করা যায়?

ক. জাগতিক সম্পদ গ্রহণ করে খ. আত্মীয় স্বজনকে সম্মান করে

গ. ভোগ বিলাসিতা বিসর্জন দিয়ে ঘ. সঞ্চয় করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমনা ও মোহনা খুব ভালো বন্ধু। দুজনেই পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং অন্যদেরকে সহযোগিতা করে। কিন্তু তাদের শ্রেণির রিনা তাদের খুব বিরক্ত করে, খারাপ কথা বলে, অশালীন পোশাক পরে অন্যদেরকে উৎসাহিত করে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সকলে মিলে রিনাকে বের করে দেওয়ার কথা বললে প্রধান শিক্ষক বললেন, 'ফলাফল দেওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

৩. প্রধান শিক্ষকের আচরণে কোন উপমার শিক্ষা প্রকাশ পায়?

ক. জাল ভর্তি মাছের খ. শর্ষের

গ. শ্যামা ঘাসের ঘ. খামিরের

৪. উপমার আলোকে প্রধান শিক্ষকের উক্তিটির মর্মার্থ হলো –

ক. শেষ বিচারের সময় খ. বৎসরের শেষ সময়

গ. ফলাফল দেওয়ার সময় ঘ. আগমনের সময়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বিজয় ও তার বন্ধুরা মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা আদায় করত। এভাবে সে বাড়িতে অনেক সম্পদ গড়ে তোলে। এক সময় ফাদার তার বাড়িতে এসে বললেন, 'এসব ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। তুমি ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করবে।' বিজয়ের এতদিনের কাজ, চাঁদা আদায় সব ছেড়ে দিয়ে সে ফাদারের সঙ্গে কাজ করে। পরে বিজয় তার সম্পত্তি থেকে গরিবদের টাকা বিতরণ করে। ফাদারকে নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায়। পরবর্তীতে সে দীন দরিদ্র, গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বাণী প্রচার ও সেবামূলক কাজ করে।

ক. যারা যীশুর বাণী শোনে ও পালন করে তারা কেমন মানুষ?

খ. ঐশরাজ্য বলতে কী বোঝায়– ব্যাখ্যা কর।

গ. বিজয়ের কাজের মধ্যে করগ্রাহক মথির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিজয়ের ও মথির কাজের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. অণুর কাকা বড় লোক, তাই তার কাকা তাদের ঘৃণা করত। কাকাত ভাইয়েরা জমি নিয়ে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করত। এসব দেখে অণু চিন্তা করত, মানুষ কেন এ কাজগুলো করে? অণু দেখেছে তাদের গ্রামের চেয়ারম্যান খুব দাপটের সঙ্গে চলত, অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতো এবং বিনা কারণে

অত্যাচার করত। এ অন্যায়গুলো অণুকে খুব কষ্ট দিত। অণু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল এবং সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দুস্থদের জন্য জমি কিনে ঘর তুলে দেয়, অসুস্থ লোকদের চিকিৎসার জন্য সেবাকেন্দ্র চালু করে। এভাবে অণু প্রত্যেককে ভালো পথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়।

ক. যীশু কার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন?

খ. আমাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. অণুর গ্রামের চেয়ারম্যানের মধ্যে কোন রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অণু ও চেয়ারম্যানের মধ্যে ঐশরাজ্য ও জাগতিক রাজ্যের বিষয়গুলো লক্ষণীয়–পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঐশরাজ্য বলতে কী বোঝায়?

২. যীশুর আহ্বানে সাড়া দিতে হলে আমাদের কী করতে হবে?

৩. জালভর্তি মাছের উপমার অন্তর্নিহিত অর্থ লেখ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঐশরাজ্য ও জাগতিক রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. ঐশরাজ্য বিস্ত ারের জন্য আমরা কীভাবে কাজ করব?

৩. শ্যামা ঘাস ও গমের দানার উপমা কাহিনীটি অর্থসহ নিজের ভাষায় লেখ।

নবম অধ্যায়

ন্যায্যতা, শান্তি ও আত্মসংযম

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের দরকার মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলি সমৃদ্ধ একটি খ্রিষ্টীয় সমাজ। যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করে চলার জন্য ও আদর্শ পরিবার গঠনের মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে সার্বজনীন বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার জন্য দরকার ন্যায্যতা। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার প্রয়োজনে সকলের সাথে সহাবস্থান করতে হবে এবং এর জন্য প্রত্যেকের মাঝে থাকতে হবে আত্মসংযম। এই সকল গুণ নিয়ে বেড়ে উঠলে অবশ্যই ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক পরিবেশ হবে সুখময়, যা সবারই কাম্য।

ন্যায্যতার প্রতীক দাঁড়িপাল্লা

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- ন্যায়বিচারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ন্যায়বিচার সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- পরিবার ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারব;
- সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি আনয়নে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পবিত্র বাইবেলে আত্মসংযম বিষয়ক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব;
- নিজ জীবনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মসংযমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ জীবন, পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবো।

পাঠ ১ : ন্যায্যতা

ন্যায্যতা হলো একটি নৈতিক গুণ। ন্যায্যতাকে নৈতিক গুণ বলা হয় এই কারণে যে, এটি যার মধ্যে আছে, সে নৈতিক চরিত্রবান ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ন্যায্যতা হচ্ছে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়ার অবিচল ও অবিরাম ইচ্ছা। কাজেই ন্যায্যতা দুই রকমের আছে–ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতা এবং মানুষের প্রতি ন্যায্যতা। ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় "ধর্মের গুণ"। মানুষের প্রতি ন্যায্যতা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানব সম্পর্কের মধ্যে মিলন স্থাপনের ইচ্ছা জাগ্রত করা। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক সমতা যা ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের সাথে সম্পর্কিত। পবিত্র বাইবেলে ন্যায্যতার কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায্যতার নিজস্ব গভীরতম গুণ হলো সর্বদা অভ্যাসগত ও ন্যায়সম্মত চিন্তা করা ও প্রতিবেশীর প্রতি আচরণে সর্বদা সততা বজায় রাখা।

ন্যায্যতার বিশেষ দিকগুলো হলো :

১। সঠিক, যুক্তিযুক্ত, যথাযথ বা সুবিচারপূর্ণ হওয়া;

২। সমাজের প্রথাগত নৈতিক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বা সেগুলো অনুসরণ করে চলা;

৩। নৈতিক বাধ্যবাধকতাসমূহের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থাকা;

৪। মানবীয় ও ঐশ্বরিক আইনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা;

৫। পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে সততা অনুসরণ করা;

৬। আচরণ ও মতামত প্রকাশে বিশ্বস্ত হওয়া এবং বাস্তবতার সাথে মিল রাখা;

৭। কাজেকর্মে সৎ, বিশ্বস্ত ও নিরপেক্ষ থাকা।

ন্যায় কাজ করা মানেই অপরের জন্য সঠিক কাজ করা। ন্যায় থেকে আসে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা অন্তরে স্থান দেওয়ার অর্থই মানবিক মূল্যবোধে নিজেকে আলোকিত করা। যে কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যায্যতা অতীব প্রয়োজনীয় একটি গুণ যা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে।

কাজ : সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যায্যতা আছে ও কোন কোন ক্ষেত্রে নেই তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তালিকাবদ্ধ কর ও পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২ : বাইবেলে ন্যায্যতা বিষয়ক শিক্ষা

ঈশ্বর ন্যায়বান। পবিত্র বাইবেলের অনেক স্থানে আমরা এই বিষয়ে বক্তব্য শুনি। প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে আমরা শুনতে পাই, "তবুও ঈশ্বর কিন্তু সেই দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন যখন তিনি তোমাদের প্রতি নিজের করুণা দেখাতে পারবেন; সেদিন তিনি তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করে তোমাদের দয়াই করবেন। ঈশ্বর তো ন্যায়বান; তাঁর পথ চেয়ে থাকে যারা ধন্য–ধন্য তারা সকলেই!" (ইসা ৩০:১৮)। সামসঙ্গীতে আমরা একই ভাব লক্ষ করি। এখানে বলা হয়েছে, "ধার্মিকতা ও ন্যায়নীতিতে পরম প্রীত তিনি; ঈশ্বরের ভালোবাসায় জগৎ উচ্ছলিত!

(সাম ৩৩:৫)। প্রবক্তা ইসাইয়ার মুখ দিয়েই আরও শুনি, "আমি এই যা বলছি, তা মন দিয়ে শোন তোমরা, যারা আমার আপন মানুষ; কান পেতেই শোন তোমরা, যারা আমার আপন জনগণ! শিক্ষাবাণী আমারই মুখ থেকে উচ্চারিত হবে, আমার ন্যায়নীতিকে আমি অচিরেই বিজাতীয়দের আলো করে তুলব।" (ইসা ৫১:৪-৫)। "কারণ আমি, ঈশ্বর, ন্যায়নীতি ভালোবাসি, যত চুরি জোচ্চুরি ঘৃণার চোখেই দেখি; তাই বিশ্বস্ত ভাবেই তাদের পুরস্কৃত করব সেদিন।" (ইসা ৬১:৮)।

ন্যায়বান ঈশ্বর তাঁর জাতিকে ন্যায্যতা সহকারে অর্থাৎ ঠিকমতোই পালন করেন। মেষদলের সাথে তাঁর জাতির লোকদের তুলনা করে তিনি বলেন, "আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে প্রতিপালন করব, নিজেই তাদের দেব শয়নের স্থানে কথা বলছেন স্বয়ং প্রভু ঈশ্বর। যে-মেষটি হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে যাব; যেটি দলছাড়া হয়ে পড়েছে, তাকে দলে ফিরিয়েই আনব। যেটি আহত হয়েছে, তার ক্ষতস্থান আমি বেঁধে দিব; যেটি রুগ্ন, তাকে সুস্থ সবল করে তুলব। আর যে মেষটি নধর, যে-মেষটি সুস্থ সবল, তাকে সর্বদাই আগলে রাখব আমি। আমার মেষগুলোকে আমি ন্যায্যতা সহকারেই প্রতিপালন করব।" (এজেকিয়েল ৩৪:১৫-১৬)।

ন্যায়বান ঈশ্বরের কাছ থেকে দীনদুঃখীরা সুবিচার পাবেই। সামসঙ্গীতের ভাষায় আমরা শুনতে পাই, "জানি, আমি জানি, দীনদুঃখী মানুষেরা ঈশ্বরের সুবিচার পাবে; দরিদ্রেরা পাবে নিজেদের ন্যায্য অধিকার।" (সাম ১৪০:১২)। কিন্তু অন্যদিকে যীশু সমালোচনা করেন শাস্ত্রী ও ফরিসিদের। কারণ তারা ন্যায়নিষ্ঠতা পালন করেন না। তিনি বলেন, "হায় হায় আপনারা, শাস্ত্রীরা আর ফরিসিরা, যত ভণ্ডের দল! আপনারা তো আপনাদের পুদিনা, মৌরী আর জিরার দশ ভাগ নৈবেদ্য হিসাবে দিয়েই থাকেন, অথচ বিধানের গুরুতর নির্দেশগুলো যেমন : ন্যায়নিষ্ঠা, দয়ামায়া, বিশ্বস্ত তার নির্দেশ–এগুলো আপনারা কিন্তু উপেক্ষাই করেন।" (মথি ২৩:২৩)।

শিষ্যচরিত গ্রন্থে আমরা দেখি, ঈশ্বর জগৎসংসারের ন্যায়বিচার করবেন, "মানুষ যে যুগে এই কথা বুঝতে পারত না, সেই যুগে পরমেশ্বর তা ক্ষমার চোখেই দেখেছেন; কিন্তু এখন মানুষের কাছে তাঁর আদেশ এই যে, সকল জায়গার সকল মানুষকেই মন ফেরাতে হবে। কারণ তিনি এমন একটি দিন স্থির করে রেখেছেন, যেদিন তিনি জগৎসংসারের ন্যায়বিচার করবেন; আর তিনি তা করবেন তাঁরই মনোনীত একজন মানুষের দ্বারা। এর প্রমাণও তিনি তো দিয়েছেন; সেই মানুষটিকে তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।" (শিষ্য ১৭:৩০-৩১)। তাই সামসঙ্গীতের মাধ্যমে ন্যায়বান মানুষকে প্রশংসা করা হচ্ছে– "ধন্য তারা, ন্যায়নীতি মেনে চলে যারা, সর্বদাই ন্যায়কর্ম করে চলে যারা।" (সাম ১০৬:৩)।

ন্যায়বান ঈশ্বর চান তাঁর জাতির লোকেরা যেন ন্যায়বান হয়ে ওঠে, "শোন, মানুষ, যা শ্রেয়, যা ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে পেতে চান, তা তিনি তো নিজেই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন! আর কিছু নয় শুধুমাত্র ন্যায়ধর্ম পালন করা, ভক্তি ভালোবাসাকে হৃদয়ে গেঁথে রাখা আর নম্র চিত্ত নিয়ে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গী হয়ে জীবনপথে চলা, আর কিছু নয়, এই তো তিনি চান।" (মিখা ৬:৮)। খাঁটি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঈশ্বর আরও বলেন, "বিশ্বপতি ঈশ্বর তো বারবার এই কথা বলছেন : ন্যায়নীতির মানদণ্ডেই শাসন কর! একজন আর একজনের প্রতি ভালোবাসা মায়ামমতা দেখাও। কোনো বিধবা, অনাথ, প্রবাসী বা দীনজনের ওপর শোষণ চালিয়ো না। মনে-মনে কেউ কারও অনিষ্ট করার মতলব এঁটো না।" (জাখারিয় ৭:৯)। ঈশ্বর চান যেন তাঁর সেবক নিজ

দেশে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেন, "এই দেখ আমার সেবক, আমার মনোনীত জন; এ আমার একান্ত প্রিয়জন, আমার প্রাণের প্রীতিভাজন! আমি এর ওপর আমার আত্মিক প্রেরণার অধিষ্ঠান ঘটাব; এ তো সকল জাতির কাছে ঘোষণা করবে ঐশ ন্যায়নীতির বাণী।" (মথি ১২:১৮)। তাই তাঁর সেবকের ডাক শুনে কেউ যদি না-ও আসে, তবুও একা হলেও তাকে ন্যায়নীতি অনুসরণ করতে হবে, "ন্যায়নীতির পথেই চলবে তুমি, ন্যায়নীতিরই পথে, তাহলে তুমি প্রাণে বেঁচে থাকবে এবং তোমার ঈশ্বরের দেওয়া দেশ নিজের অধিকারে রাখতেও পারবে।" (দ্বি:বি: ১৬:২০)। ঈশ্বর তাঁর সেবককে স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি যেন সকলের জন্যই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন, "যে লোক প্রবাসীকে, অনাথকে বা বিধবাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তার ওপর বর্তাবে অভিশাপ!" (দ্বি:বি: ২৭:১৯)।

ইসাইয়া বলেন, "হায় রে তারা, যারা অন্যায় যত বিধিনিয়ম জারি করে থাকে, যারা রচনা করে যত অত্যাচারের আইন। এইভাবে তারা দুর্বল-অসহায় মানুষকে ন্যায়বিচার পেতেই দেয় না, আমার জাতির যত দীনদরিদ্রকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতই করে। তারা বিধবাদের করে তোলে নিজেদের স্বার্থের শিকার; অনাথদের সব-কিছু কেড়ে নেয় তারা।" (ইসা ১০:১-২)

কাজ : ন্যায্যতা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের উদাহরণগুলোর সারাংশ খাতায় লেখ।

পাঠ ৩ : পরিবার ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা

অষ্টকল্যাণ বাণীর চতুর্থ বাণীতে যীশু বলেছেন, "ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, ধন্য তারা–তারাই পরিতৃপ্ত হবে।" (মথি ৫:৬)। ধর্মময়তার অর্থ ন্যায্যতা। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, অর্থাৎ যাদের মনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত বাসনা আছে ও সর্বদা শতকরা একশত ভাগ চেষ্টা করে, তারা ঈশ্বরের চোখে ধন্য। সাধু টমাস আকুইনাসের মতে "ন্যায্যতা হলো যার যা পাওনা তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্রমাগত ইচ্ছা।" 'যার যা পাওনা' বলতে দুই ধরনের পাওনা বোঝায়। প্রথমটা হলো মানুষের পাওনা আর দ্বিতীয়টা হলো ঈশ্বরের পাওনা। যীশু একবার বলেছিলেন, যা সিজারের, তা সিজারকেই (অর্থাৎ মানুষকে) দাও; আর যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকেই দাও।" (মথি ২২:২১)। এই দুই ধরনের পাওনা যখন আমরা মিটিয়ে দিতে পারি তখনই আসে প্রকৃত ন্যায্যতা।

প্রথমে আমরা দেখি কীভাবে আমরা ঈশ্বরের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারি। ঈশ্বরের পাওনা যথাযথভাবে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি :

১। সবসময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করা বা তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করা। আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি। বিবেকের কথা মেনে আমরা কাজ করলে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলা হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলার জন্য যদি আমরা সত্যিই তৃষ্ণার্ত হই তবে আমাদের ভিতর থেকে সর্বদাই তাঁর ইচ্ছা পালনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। আমাদের প্রভু যীশু সর্বদা পিতার ইচ্ছা পালন করতেন। কারণ তিনি পিতার ইচ্ছা পালনের জন্য তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। যীশু বলেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। যে সমস্ত কাজে তিনি প্রীত হন, আমি সর্বদা তা-ই করে থাকি।" (যোহন ৮:২৯)। তিনি আরও বলেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা মেনে চলা এবং তাঁর দেওয়া কাজ সম্পন্ন করা, সেই তো আমার

খাবার।" (যোহন ৪:৩৪)। গেৎসিমানী বাগানে প্রার্থনা করার সময়ও যীশু পিতার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : পিতা, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এভাবে পিতার ইচ্ছা পালনের মাধ্যমে যীশু পিতার সাথে সম্পর্ক রাখেন। তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশে বলেন, যারা আমাকে শুধু "প্রভু, প্রভু" বলে তারা নয়, বরং যারা পিতার ইচ্ছা জেনে তা পালন করে তারাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। তিনি আমাদেরকে যে প্রার্থনাটি শিখিয়েছেন, সেখানেও তিনি আমাদেরকে পিতার ইচ্ছা পালনের বিষয়টি শিখিয়েছেন। আর একবার তিনি যখন লোকদের মাঝে কথা বলছিলেন, তখন একজন এসে বলল যে তাঁর মা ও ভাইয়েরা বাইরে অপেক্ষা করছেন। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "কে আমার মা, আর কারাই বা আমার ভাই? যে-কেউ আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই তো আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা।" (মথি ১২:৪৬-৪৯)।

২। আমাদের প্রতিদিনকার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের মধ্য দিয়েও পিতার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। সেই কাজগুলো হোক ছোট হোক বড়, সবই আমাদের যথাযথ চেষ্টা করতে হবে ভালোভাবে করার জন্য। সেগুলো পালন করার মাধ্যমেও আমরা পবিত্রতার পথে এগিয়ে চলতে পারি। এগুলোর মাধ্যমেই আমরা পিতার যা পাওনা তা পিতাকে দিতে পারি।

৩। আমাদের সকলকেই ঈশ্বর কিছু-না-কিছু গুণ দিয়েছেন। সেগুলো যদি আমরা যথাযথভাবে বিকশিত করে তোলার মাধ্যমে ফলশালী হই তখন আমরা ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিতে পারি। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি যীশুর সেই উপমাটি। যে ব্যক্তি পাঁচ শ' মোহর পেয়েছিল সে তা বাড়িয়ে এক হাজার বানিয়েছিল। যে ব্যক্তি দুই শ' মোহর পেয়েছিল সেও তা বাড়িয়ে চার শ' বানিয়েছিল। তাই মনিব তাদের দুইজনকেই প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এক শ' মোহর পেয়েছিল সে তা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছিল। মনিব তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আমাদেরও ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণগুলো বাড়িয়ে তুলতে হবে। তবেই আমরা ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিতে পারি।

এবার আসা যাক মানুষের যা পাওনা তা মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিতে। নিম্নলিখিতভাবে আমরা মানুষের পাওনা মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারি–

১। আমার পরিবার, সমাজ ও মন্ডলী–যেখানে আমি বাস করছি, আমার চারপাশে যারা আছে, তাদের প্রতি আমার করণীয়সমূহ যথাযথভাবে করার মাধ্যমে আমি তাদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

২। অন্যের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে আমরা অন্যদের প্রতি আমাদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

৩। অন্যের বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ইত্যাদিকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়ে আমরা অন্যদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

৪। চিন্তা, কথা ও কাজে সততার পরিচয় দিয়ে খাঁটি ও খোলামনের মানুষ হয়ে আমরা সকল মানুষের কাছে তাদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

৫। মানুষের মধ্য দিয়ে হোক বা সরাসরি হোক, প্রতিদিনই আমরা যতকিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে পাচ্ছি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা অন্যদের পাওনা ফিরিয়ে দিতে পারি।

কাজ : ঈশ্বর ও মানুষের সাথে ন্যায্যতার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার তা দুইটি কলামে লেখ।

পাঠ ৪ : ন্যায্যতার ফল শান্তি

পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষ শান্তি চায়। ঈশ্বরও সকল মানুষকে শান্তি দিতে চান। সেজন্যেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এজগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানব হয়ে জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্বে প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেছিলেন, "অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক; ছায়াচ্ছন্ন দেশে যারা বাস করছিল, তাদের উপর ফুটে উঠেছে একটি আলো। হে ঈশ্বর, তুমি তাদের দিয়েছ অসীম আনন্দ, কত গভীর তাদের উল্লাস। তোমার সঙ্গসুখে তারা আনন্দিত, মানুষ যেমন আনন্দিত হয় ফসল কাটার সময়ে, মানুষ যেমন উল্লসিত হয় লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করার সময়ে। কেননা যে জোয়ালের ভার তাদের উপর চেপে বসেছিল, যে-বাঁক তাদের কাঁধের উপর দুর্বহ হয়ে উঠেছিল, এবং তাদের নির্যাতকের সেই যে-বেতখানি, সবই তুমি ভেঙে ফেলেছ, যেমনটি ভেঙেছিলে মিদিয়ানের সেই পরাজয়ের দিনে। সৈন্যদের মাটি-কাঁপানো যত রণপাদুকা, রক্তমাখা যত পোশাক, সবই এবার পুড়িয়ে দেওয়া হবে, সবই আগুনের গ্রাসে ছাই হয়ে যাবে। কেননা আমাদের জন্যে একটি শিশু যে জন্ম নিয়েছেন, একটি পুত্রকে আমাদের হাতে যে তুলেই দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধের উপর রাখা হয়েছে সব কিছুর আধিপত্যভার। তাঁকে ডাকা হবে অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ, এমনি সব নামে। আহা! এবার শুরু হবে দাউদের সেই সিংহাসনের, সেই রাজত্বের সুবিস্তৃত আধিপত্যের যুগ, অনন্ত শান্তির যুগ।"(ইসা ৯:১-৬)।

উপরের এই শাস্ত্র পাঠ থেকে আমরা দেখতে পাই– পাপ দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরত্ব নিয়েছিল। মানুষ ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে ও তাঁকে ভালোবাসতে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর ন্যায়বান। মানুষের কষ্টের বোঝা এবার তিনি লাঘব করার জন্য দয়া দেখালেন।

আমরা উপরে দেখেছি, ন্যায্যতার ফল হলো শান্তি। কারণ আমরা জানি, যার যা পাওনা তাকে তা দিয়ে দেওয়ার অর্থই ন্যায্যতা। আমরা আরও দেখেছি, ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরকে দিলে এবং মানুষের পাওনা মানুষকে দিলে ন্যায্যতা হয়। এভাবে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে আমাদের ন্যায্যতার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে সৃষ্টি হয় শান্তি। এখন কারও বিরুদ্ধে আর কারও কিছু বলার নেই। সবাই সুখী।

শাস্ত্র পাঠটিতে আমরা আরও দেখেছি, ঈশ্বর মানুষের সাথে সম্পর্ক সুন্দর করার জন্য নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। পুত্র ঈশ্বর আমাদেরকে পাপের ছায়া থেকে উদ্ধার করার জন্য ক্রুশের উপর প্রাণ দিয়েছেন। এভাবে তিনি ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে পুনর্মিলন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এখন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আর দূরত্ব নেই। আমাদের এখন সর্বদা চেষ্টা করে চলতে হবে যেন ঈশ্বরের সাথে আমাদের এই সম্পর্ক নষ্ট না হয়। আমরা যেন আমাদের পাপ দ্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরত্ব না নেই।

আরও একটা দিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক ঠিক রাখতে হবে। আমরা যখন প্রত্যেক মানুষকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেই তখনই মানুষের সাথে আমাদের ন্যায্যতার সম্পর্ক বিরাজ করে। এই ন্যায্যতার ফলে বিরাজ করে শান্তি।

কাজ : ১। নিজ নিজ পরিবারে শান্তি বজায় রাখার জন্য তুমি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার তা লেখ।

কাজ : ২। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ও দলীয়ভাবে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের কর ও উপস্থাপন কর।

পাঠ ৫ : আত্মসংযম

আত্মসংযম হচ্ছে নিজের আবেগ–অনুভূতি এবং বিভিন্ন কিছুতে নিজের প্রতিক্রিয়া দমন করার সক্ষমতা। অন্য কথায় এটাকে আমরা বলে থাকি আত্মশৃঙ্খলাবোধ। কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারে আত্মসংযম দ্বারা মানুষের আচরণ সীমিত করে ফেলা হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। বিজ্ঞতা ও সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ব্যবহার করলে আত্মসংযম আত্ম-উন্নয়ন ও কৃতকার্যতা অর্জনের একটা বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।

নিম্নলিখিতভাবে আত্মসংযম আমাদের উপকারে আসে

১। এটি আমাদেরকে মাদকাসক্ত হওয়ার মতো আত্ম-বিধ্বংসীমূলক কাজ করা অথবা মোহাবিষ্ট হয়ে খারাপ পথে পা বাড়ানো থেকে বিরত রাখে;

২। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর নিজের দখল রাখতে এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন করতে সহায়তা করে;

৩। অত্যধিক আবেগপ্রবণ কাজ করা থেকে বিরত রাখে অর্থাৎ আবেগ দমন করতে সহায়তা করে;

৪। অসহায়ত্বপূর্ণ অনুভূতি আসতে দেয় না এবং অন্যদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কমায়;

৫। আত্মসংযম দ্বারা আমরা মানসিক ও আবেগীয় নিরাসক্তি আনতে সক্ষম হই। এই নিরাসক্তি মনের প্রশান্তি আনয়নে সহায়তা করে;

৬। এটি আমাদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে এবং নেতিবাচক চিন্তা ও অনুভূতিগুলো বর্জন করতে শেখায়;

৭। আত্মসংযম আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ, দৃঢ়চিত্ততা, অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর করে;

৮। এটি আমাদের নিজেদের জীবনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে;

৯। এটি আমাদেরকে দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষে পরিণত করে।

আত্মসংযমের এত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এর পথে অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ

১। আত্মসংযম সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞানের অভাব একটি বড় বাধা;

২। কঠিন ও অনিয়ন্ত্রিত আবেগীয় প্রতিক্রিয়া;

৩। পূর্বাপর চিন্তাভাবনা না করে, শুধু বাহ্যিক নমুনা দেখেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা;

৪। শৃঙ্খলাবোধ ও ইচ্ছাশক্তির অভাব;

৫। নিজেকে পরিবর্তন ও উন্নত করার ইচ্ছার অভাব;

৬। আচরণ সীমিতকরণের মাধ্যম হিসেবে আত্মসংযমকে দেখা।

পাঠ ৬ : বাইবেলে আত্মসংযম বিষয়ক শিক্ষা

আত্মসংযমের একটা মূল্যবান শিক্ষা আমরা পাই আদিপুস্তক কে যোসেফের কাছ থেকে। যোসেফের ভাইয়েরা যোসেফের উপর ঈর্ষান্বিত ছিল। তারা যোসেফকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মিশরীয় বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিল। বণিকরা তাঁকে নিয়ে বিক্রি করল ফারাও রাজার রক্ষীদলের প্রধানের কাছে।

সেই প্রধানের বাড়িতে সব কাজকর্মের দায়িত্ব পেলেন। যোসেফ ছিলেন লম্বাদেহী সুদর্শন যুবক। কিছুদিন যেতেই মনিবের স্ত্রী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি তাঁকে মন্দ কাজে অনেক প্রলোভন দিলেন। কিন্তু সবসময়ই যোসেফ তাকে বললেন "না।" এতে মনিবের স্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ রটালেন। ফলে যোসেফকে জেল খাটতে হলো। এতেও যোসেফ তাঁর নীতিতে বিশ্বস্ত থাকলেন।

যোসেফের মধ্যে আমরা দেখি সাধু পলের একটা শিক্ষা যথাযথভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে। সাধু পল বলেন, "তাই বলছি, ব্যভিচার থেকে দূরেই থাকো। মানুষ আর যে-কোনো পাপই করুক না কেন, সে সব পাপ ঘটে দেহের বাইরে। কিন্তু ব্যভিচার যে করে, সে আপন দেহের বিরুদ্ধে গিয়েই পাপ করে। তোমরা কি এই কথা জানো না যে, তোমাদের দেহ হলো তোমাদের অন্তর-নিবাসী সেই পবিত্র আত্মার মন্দির, যাঁকে তোমরা পেয়েছ পরমেশ্বরের কাছ থেকে; তোমরা তো নিজেদের মালিক নও; প্রভু মূল্য দিয়ে তোমাদের যে কিনেই নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈহিক আচরণের মধ্য দিয়েই পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর।"(১করি ৬:১৮-২০)।

দানিয়েল ছিলেন একজন যুবক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন যুবক, যথাক্রমে হানানিয়া, শাদ্রাক ও মিশায়েল। তাঁদের জন্য রাজা তাঁর টেবিল থেকে খুব সুস্বাদু খাবার পাঠাতেন। কিন্তু তাঁরা সেগুলো না খেয়ে নিরামিষ খাবার খেতেন। তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ শুধু নিরামিষ খাবার খেয়ে সুন্দর স্বাস্থ্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা ঐ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতে পেরেছিলেন। এটা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। কারণ তাঁরা আত্মসংযম করতে শিখেছিলেন।

আত্মসংযমের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পেতে পারি যীশু খ্রিস্টের কাছ থেকে। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই দীক্ষাস্নান লাভের পর শয়তান যীশুকে নিয়ে গেল মরুপ্রান্তরে। সেখানে তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস করেছিলেন। না খেয়ে তিনি খুব ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় শয়তান তাঁকে প্রলোভিত করতে এসেছিল। সব পরীক্ষা যীশু জয় করতে পেরেছিলেন প্রার্থনার শক্তিতে। যীশু শয়তানকে বলেছিলেন- "দূর হও শয়তান।" সেই মুহূর্তেই শয়তান তাঁর কাছ থেকে দূর হয়ে গেল।

কাজ : পবিত্র বাইবেলের আত্মসংযম বিষয়ক শিক্ষাগুলো কী কী ভাবে বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের কর ও পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ ৭: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আত্মসংযম

মানুষ দ্বীপের মতো বাস করতে পারে না, কারণ মানুষ সামাজিক জীব। তার বাস করতে হয় সমাজের অন্যদের সাথে মিলেমিশে। যাদের সাথে সে বাস করে তারাও তারই মতো সামাজিক। তাই তাদের সাথে তার সামাজিক আচরণ করতে হয়। সকলের সাথে শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণভাবে জীবন যাপন করার লক্ষ্যে মানুষকে অনেক ব্যাপারে নিজের আচার-আচরণ দমন করতে হয়। অন্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজের অনেক কিছু প্রকাশ না করে থাকতে হয়।

প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্ক রচনা করতে হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্য, পরিবারের বাইরের বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন পরিচিতদের সাথে। একসাথে থাকতে গেলে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয় দেনা-পাওনার মাধ্যমে। পাওয়ার চাইতে দেওয়ার উপর যারা জোর দেয় বেশি তারা সুখীও হয় বেশি। কারণ যারা দেওয়ার চাইতে পাওয়ার উপর বেশি জোর দেয় তারা অপরের কাছে ঋণী হয়ে যায়। তাতে অন্তরে আনন্দ থাকে না। সেই জন্য পাওয়ার জন্য একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা দমন করতে শিখতে হয়।

আত্মসংযম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

বিবাহের দিন থেকে শুরু করে স্বামী ও স্ত্রী একসাথে থাকতে শুরু করে। সারা জীবনই তারা একত্রে থাকে। দুইজনের ব্যক্তিত্ব দুইরকম। তাদের আচার-আচরণের কাঠামোও ভিন্ন। এই পার্থক্যগুলো আছে বলে সহজেই তাদের একের বিরুদ্ধে অপরের অনেক কিছু বলার থাকে। কিন্তু বৈবাহিক সূত্রে একত্রে মিলেমিশে থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন বলে তারা আত্মসংযম করেন ও অনেক কিছু ক্ষমার চোখে দেখেন। ফলে তাদের ঝগড়া-বিবাদের পরিমাণ অনেক কমে আসে। এভাবেই তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সুন্দর ও মধুর হয়। স্বামী-স্ত্রী সবসময় একে অপরের বিষয়ে মন্তব্য করার ফলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সেজন্যে কখনো কখনো চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রে দরকার হয় আত্মসংযম।

পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কে আত্মসংযম

পৃথিবীর মধুরতম সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম হলো পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্ক। কিন্তু সন্তান তার মা ও বাবার সাথে এক পরিবারে বসবাস করতে করতে অনেকবার পরিবারে বিবাদ বা ঝগড়াঝাঁটি দেখে থাকে। সন্তানটি যখন দৈহিকভাবে বড় হতে থাকে তখন তার দৈহিক নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে তার মনের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় সন্তানদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। এসময় মা ও বাবাকে অসীম আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়, সন্তানদের সাথে তাদের প্রচুর পরিমাণে ধৈর্যশীল হতে হয়। সন্তানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য বাবা ও মা উভয়কেই অনেক অপেক্ষা করতে হয়। এসময় তাদের আত্মসংযম দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, সন্তান কোনো ভুল করলে বাবা-মা যদি উত্তেজিত হয়ে সন্তানকে গালাগালি করতে শুরু করে বা মারধরও করে ফেলে তাতে সন্তানের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে মা-বাবা সন্তানদের সাথে সহনশীল আচরণ করতে থাকবেন যতদিন সন্তান বয়স্ক হয়ে নিজে জেনেশুনে দায়িত্বশীল আচরণ না করে।

ভাইবোনদের মধ্যকার সম্পর্কে আত্মসংযম

শৈশব বা তারুণ্যে ভাইবোনেরা অনেক সময়ই আবেগপূর্ণ হয়ে থাকে। তারা কথা কাটাকাটি, এমনকি অনেক সময় ঝগড়ায়ও লিপ্ত হয়ে যায়। যুক্তি দিয়ে কথা বলা এবং যুক্তি সহজভাবে গ্রহণ করার তাৎপর্য তারা বুঝে উঠতে পারে না। ভাইবোনেরা কোনো কোনো সময় মা-বাবার অনুপস্থিতিতে কোনো পরিবেশে থাকলে তাদের মধ্যকার বড় জন সাধারণত তুলনামূলকভাবে বেশি দায়িত্বশীল ও সহনশীল হয় এবং বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকে। তখন তাদের সহনশীল হতে হয়। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মসংযমের জন্ম হয় বড়দের কথা ও আচরণে। কেননা, যদি কখনো ছেলেমেয়েরা আত্মসংযমের অভাবের পরিচয় দেয় তখন বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অন্য কোনো গুরুজন তাদের তিরস্কার করে। এগুলো যেন ভবিষ্যতে আর শুনতে না হয় সেই কারণে ছেলেমেয়েরা আত্মসংযমের চর্চা করতে শুরু করে। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে আত্মসংযম দৃঢ় হয়ে ওঠে।

বয়স্ক ভাইবোনদের মধ্যে কখনো ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হলে অন্তত একজনকে আগে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়। আর তখন তাদের মধ্যে পরিবেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পরিবারের বাইরে পরিচিতদের সাথে আত্মসংযম

প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের সাথে তাদের পরিবারের বাইরে অনেকের সাথে পড়াশোনা বা কর্তব্যের খাতিরে বন্ধু-বান্ধব সৃষ্টি হয় বা পরিচয় হয়। পরিবারের সদস্যদের সাথে যতখানি খোলামেলা কথা বলা যায় বা প্রয়োজনে কথা কাটাকাটি করা যায়, বাইরের পরিচিত বা বন্ধুদের সাথে ততখানি করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে অনেক আত্মসংযমের পরিচয় দিতে হয়। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই আত্মসংযম জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ ঘরে বাবা অথবা মা তিরস্কার করলে বা গালি দিলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করা যায়, অফিসের বসের সাথে সেভাবে করা যায় না। এক্ষেত্রে অনেক আত্মসংযম প্রয়োজন হয়।

এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মসংযমের উপর। মতামত প্রকাশে বা যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে যত বেশি সংযমী হওয়া যায়, পারস্পরিক সম্পর্ক তত বেশি গভীর হয়। এভাবে নিজ নিজ আত্মসম্মানবোধও বৃদ্ধিলাভ করে।

কাজ : ব্যক্তিগত জীবনের আত্মসংযম কীভাবে সমাজের উপকারে আসতে পারে তা খাতায় লেখ।

পাঠ ৮ : অন্তরে আত্মসংযম রোপণ করা

১। প্রথমে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মসংযম দরকার। সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ হতে পারে :

ক) খাওয়াদাওয়া

খ) বিশ্রাম

গ) মানুষের সাথে কথা বলা

ঘ) পরচর্চা

ঙ) ধূমপান

চ) খেলাধুলা

ছ) শিশুদের সাথে আচরণ

২। উপরের কোন দিকটির কী ধরনের আবেগ (যেমন, রাগ, চাপা ক্ষোভ, অসন্তোষ, হতাশা, আনন্দ, ভয়) আমার দমন করা বেশি প্রয়োজন?

৩। কী ধরনের চিন্তা ও বিশ্বাস আমাকে ঐ ধরনের আচরণের মুখে ঠেলে দেয়?

৪। নিচের বিষয়গুলোর একেকটার উপর একেকবার কিছুক্ষণ চিন্তা করব। এভাবে দিনের মধ্যে কয়েকবার বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করব, বিশেষভাবে যে মুহূর্তগুলোতে আমার আত্মসংযম খুব দরকার হয় তখন।

ক) মনে মনে দুই-এক মিনিট যাবৎ বলব— আমার নিজের চিন্তা ও অনুভূতির উপর সম্পূর্ণ দখল আছে।

খ) নিজের চিন্তা ও অনুভূতি বাছাই করে নিয়ে সেগুলোর মধ্যে অনুরক্ত হওয়ার শক্তি আমার মধ্যে আছে।

গ) আত্মসংযম আমার মধ্যে অভ্যন্তরীণ শক্তি জাগ্রত করে ও আমাকে জয়লাভ করতে সাহায্য করে।

ঘ) যে কোনো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার সময় আমি নিজেকে দমন করতে পারি।

ঙ) আমি নিজেই আমার নিজের আচরণের মালিক।

চ) আমি ক্রমান্বয়ে আমার অনুভূতিগুলোকে দমন করতে পারছি।

ছ) ঈশ্বর আমাকে আমার জীবন পরিচালনা করার শক্তি দিয়েছেন।

জ) প্রতি দিনই কিছু কিছু করে আমার চিন্তা ও অনুভূতি দমনের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঝ) আত্মসংযম অনুশীলন করে আমি আনন্দ পাই।

৫। এবার মনে মনে কল্পনা করি যে আমি আত্মসংযম অনুশীলন করছি। অতীতে যেখানে আমি আত্মসংযম করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম সেরকম একটা ঘটনা স্মরণ করি। এবার মনে মনে কল্পনা করি যে সেই ঘটনাতেই আমি এবার আত্মসংযম করতে সক্ষম হচ্ছি।

৬। আমার আত্মসংযমের শক্তি তখনই বৃদ্ধিলাভ করবে ও শক্তিশালী হবে যখন আমি এটার যথাযথ অনুশীলন করব। অন্তরে আত্মসংযম রোপণ করার জন্য এটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

আত্মসংযম আমাদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ গুণ যে, এর মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত রকমের ভয়ভীতি, আসক্তি, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হই। এর দ্বারা মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে, ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধিলাভ করে। এভাবে আমরা জীবনে বড় বড় ক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারি, মহৎ মহৎ অর্জন সম্ভব হয় এবং জীবনটা আনন্দের হয়ে ওঠে।

কাজ : ১। তুমি কীভাবে নিজ অন্তরে আত্মসংযম রোপণ করবে তা চিন্তা করে বের কর ও খাতায় লেখ।

কাজ : ২। যে সমস্ত বন্ধুর আত্মসংযমের অভাব আছে তাদের জীবনে আত্মসংযম আনয়নের জন্য তোমরা সম্মিলিতভাবে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার তা স্থির কর ও উপস্থাপন কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ঈশ্বরের প্রতি ন্যায্যতাকে বলা হয় ' ... '।

২. ন্যায়বান ঈশ্বর তাঁর জাতিকে ... সহকারে অর্থাৎ ঠিকমতোই পালন করেন।

৩. 'আমার মেষগুলোকে আমি ... সহকারেই প্রতিপালন করব।'

৪. আমাদের প্রতিদিনকার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের মধ্য দিয়েও ... ইচ্ছা প্রকাশিত হয়।

৫. মানুষ হিসেবে আমরা সবাই ...।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ন্যায্যতা অন্তরে স্থান দেওয়ার অর্থই	• দীন-দুঃখীরা সুবিচার পাবেই
২. আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে আমরা	• আমাদের জীবনে শান্তির উৎস
৩. আমাদের সকলকেই ঈশ্বর	• উপর ঈর্ষান্বিত ছিল
৪. প্রভু যীশু হলেন	• মানবিক মূল্যবোধে নিজেকে আলোকিত করা
৫. যোসেফের ভাইয়েরা যোসেফের	• ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি
	• কিছু না কিছু গুণ দিয়েছেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধর্মময়তার অর্থ কী?

ক. শান্তি খ. ভালোবাসা

গ. আত্মসংযম ঘ. ন্যায্যতা

২. কোনো কোনো লোককে ঈশ্বর কেন নিজের সন্তান বলে ডাকেন?

ক. লোকদের জীবনে শান্তি আনার জন্য খ. দীন-দুঃখীদের দয়া করার জন্য

গ. অত্যাচার সহ্য করে বলে ঘ. লোকদেরকে সম্মান করে বলে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

দত্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেনেডিক্ট নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। হঠাৎ তিনি কঠিন রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলে প্রধান শিক্ষক তাঁর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা না দিয়ে বিদায় দিলেন। বিষয়টি ধর্মপল্লির পুরোহিত জানতে পেরে বেনেডিক্টকে ডেকে তার প্রফিডেন্ট ফান্ডের টাকাসহ সকল পাওনা পরিশোধ করেন।

৩. পুরোহিতের মধ্যে কোন গুণাবলি প্রকাশ পেল?

ক. ন্যায্যতা খ. দয়া

গ. করুণা ঘ. সহানুভূতি

৪. পুরোহিতের কাজের জন্য ঈশ্বর তাকে–

i. প্রতিপালন করবেন

ii. সর্বদাই আগলে রাখবেন

iii. গুরুদায়িত্ব দিবেন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রুমা দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় সে একটি বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নিল। ঐ বাড়ির গৃহকর্ত্রী রুমাকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক টাকা পয়সা ও স্বর্ণের গহনা তার সামনে খোলামেলা অবস্থায় রেখে দিতেন। কিন্তু রুমা সেই সকল জিনিস কখনো ধরে দেখেনি। গৃহকর্ত্রী দেখলেন যে রুমার মধ্যে এ সকল জিনিসের প্রতি কোনো আকাঙ্খা নেই। এমনকি রুমা ঐ গৃহে অনেক ভালো ভালো খাবার ছিল সেগুলোর স্বাদ সে কখনো গ্রহণ করেনি। সে ঐ সকল খাবারই খেত যা তার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ঐ গৃহকর্ত্রী তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাদের বাড়িতে সুন্দর একটি ঘর তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক অনুদান নেওয়ার প্রস্ত াব করেন। রুমা গৃহকর্ত্রীকে তার সুন্দর প্রস্ত াবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কিন্তু ঐ অনুদান সে গ্রহণ করেনি।

ক. সমস্ত জগৎ লাভ প্রত্যাশী ব্যক্তি কী হারায়?

খ. আমরা শান্তি খুঁজে পাব কীভাবে?

গ. রুমার আচরণে খ্রিস্টীয় কোন গুণাবলি প্রকাশ পায় পাঠ্যপুস্ত কের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রুমাই পারবে নববেশরূপে খ্রিস্টকে পরিধান করতে'– এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত পোষণ কর? তোমার মতামত দাও।

২. রবি পালমা একজন আদর্শ ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার। তিনি এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ দক্ষভাবে করে থাকেন। তিনি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না। সুবিচারের জন্য তিনি তার জনপ্রিয়তার কথাও চিন্তা করেন না। তাঁর এলাকায় এক পরিবারে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধে। তাদের পৈতৃক সম্পত্তির সাঠিক বণ্টনের বিষয় নিয়েই তাদের মধ্যে

মতানৈক্য। বড় ভাই ছোট ভাইকে সমপরিমাণ জায়গা দিতে চায় না কারণ সে তার সৎ ভাই। রবি মেম্বার বিষয়টি জানতে পেরে একটি মীমাংসা সভার আয়োজন করেন। তিনি বড় ভাইকে বলেন, 'তুমি যদি তোমার ভাইকে সমপরিমাণ জায়গা না দাও তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি যথেষ্ট আশীর্বাদ পাবে না।'

ক. আত্মসংযমের মূল্যবান শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাই?

খ. শান্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. দুই ভাইয়ের সম্পর্কোন্নয়নে রবি পালমার কোন গুণাবলি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে তা আলোচনা কর।

ঘ. রবি পালমার পরামর্শ গ্রহণ না করলে দুই ভাইয়ের পারিবারিক বন্ধন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলে কি মনে কর?— তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ন্যায্যতা বলতে কী বোঝায়?

২. ঈশ্বরের পাওনা বলতে কী বোঝায়?

৩. আত্মসংযম বলতে কী বুঝ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ন্যায়বিচার সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা কর।

২. নিজ জীবনে আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩. শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গঠনে আত্মসংযমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

বালক বয়সে থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ঈশ্বরের ডাক শুনেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করার জন্য তিনি যাজকীয় জীবন বেছে নিয়েছিলেন। যাজকীয় সেবা কাজে তিনি আমৃত্যু বিশ্বস্ত ছিলেন বলে মন্ডলী তাঁকে "ঈশ্বরের সেবক" উপাধি দিয়েছে। তিনি বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তদের কাছে পবিত্র ও সাধুতুল্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি পুরোহিত, আর্চবিশপ ও শিক্ষাবিদ হিসাবে মানুষ ও ঈশ্বরের সেবায় অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি আমাদের সামনে একজন আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। অনেকের কাছে তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত সাধু। ধীর-স্থির, শান্ত ও নম্র স্বভাবের কিন্তু অসম্ভব মেধাবী আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জীবনী পাঠ করে আমরা খ্রিস্টমন্ডলীর সেবা কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার ও পবিত্র মানুষ হয়ে ওঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করব।

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

এই পাঠ শেষে আমরা

- আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর শৈশব জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর যাজকীয় জীবন বর্ণনা করতে পারব;
- বিশপ ও আর্চবিশপ হিসেবে গাঙ্গুলীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- শিক্ষা বিস্ত ার ও যুব গঠনে তাঁর অবদানের কথা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানবকল্যাণ কাজে আগ্রহী হবো।

পাঠ ১ : আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর জন্ম ও শৈশব

বিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলীর ভাগ্যাকাশে এক নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়। এই নক্ষত্রের উদয়স্থল হলো ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার হাসনাবাদ গ্রাম। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নিকোলাস গমেজ ও রোমানা গমেজের দ্বিতীয় সন্তান থিওটোনিয়াস অমল গমেজের জন্ম হয়। দিনটি ছিল ভস্ম বুধবার। নিকোলাস ও রোমানার তিন ছেলের মধ্যে অমল ছিলেন দ্বিতীয়। বড় ছেলের নাম জেভিয়ার ও ছোট ছেলে বিমল। জন্মের আট দিন পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে হাসনাবদ গির্জায় অমলকে দীক্ষাস্নাত করা হয় এবং তাঁর নাম রাখা হয় থিওটোনিয়াস অমল গমেজ। পরে সপরিবারে তারা গমেজ নামের পরিবর্তে গাঙ্গুলী নাম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর থিওটোনিয়াস অমল গমেজকে মণ্ডলীর প্রধান করে পাঠালেন। আজ আমাদের কাছে এই মহান ব্যক্তিটি হলেন স্বর্গীয় আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি। সংক্ষেপে আমরা বলি আর্চবিশপ টি, এ, গাঙ্গুলী।

বাবা আদর করে থিওটোনিয়াসকে 'থেটন' বলে ডাকতেন। অপরদিকে ছোট বালক থিওটোনিয়াসের বুদ্ধির প্রখরতা দেখে ঠাকুরমা বরাবরই খুব খুশি হতেন। তাই তাঁর ঠাকুরমা আদরের নাতিকে 'টেটন' বলে ডাকতেন। দিনে দিনে ঠাকুরমার দেওয়া নামটি থিওটোনিয়াসের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে অর্থাৎ তার চতুরতা ও বুদ্ধির প্রখরতা সবাইকে আকৃষ্ট করে।

তিন সন্তান নিয়ে বাবা-মা নিকোলাস ও রোমানা সুখেই দিন কাটাতে থাকেন। বাবা নিকোলাস সে দিনগুলোতে কাজ করতেন কলকাতায়। আর মা রোমানা বাড়িতে থেকে সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে খুবই যত্নশীল ছিলেন। স্কুলের শিক্ষার পাশাপাশি সন্তানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবীয় শিক্ষার দিকগুলোর উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সন্তানদের প্রতিদিন খ্রিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করাকে তিনি উৎসাহিত করতেন। থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী হস্ত র্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে। তাঁরা তিন ভাই ছিলেন ভীষণ মেধাবী। তাঁরা সবাই বাড়ির কাছে স্বনামধন্য বান্দুরা হলিক্রস হাই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। বড় ভাই জেভিয়ার বান্দুরা স্কুলের পড়া শেষ করে বাবার কাছে কলকাতায় চলে যান। সেখানে সে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে কলকাতায় প্র্যাকটিস করতে শুরু করেন। ছোট ভাই বিমল বান্দুরা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন শেষ করে কলেজে পড়ার জন্য ঢাকায় চলে যান।

কাজ : তোমার এলাকার এমন একটি আদর্শ পরিবারের বিষয়ে লেখ, যে পরিবার থেকে অন্তত একজন সন্তান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে মণ্ডলীতে সেবা কাজ করছেন।

পাঠ ২ : সেমিনারীতে প্রবেশ ও যাজক পদে অভিষেক

প্রতিটি আদর্শ পরিবারের মা-বাবা সন্তানদের আদর-যত্নে লালনপালন করেন এবং স্বপ্ন দেখেন তাদের নিয়ে। নিকোলাস এবং রোমানাও একইভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাদের তিন সন্তানকে নিয়ে। তবে থিওটোনিয়াস অমলকে নিয়ে তাঁদের স্বপ্ন ছিল একটু অন্য রকম। তাঁরা অমলকে প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে যোগ দিয়ে সেবকের ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ ও বিশ্বস্ত তা দেখেছেন। তাই তাঁরা কল্পনা করেছিলেন, একদিন তাঁদের এই সন্তান যাজক হবে। আর সত্যিই দেখা গেল অমলের লক্ষ্য সেই দিকেই।

থিওটোনিয়াস অমল হাসনাবাদ প্রাইমারি স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেণির পড়া শেষ করে ভর্তি হন বান্দুরা হলিক্রস হাই স্কুলে। পড়াশোনায় মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী থিওটোনিয়াস বান্দুরা স্কুলের প্রতি শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকেন। ধাপে ধাপে সপ্তম শ্রেণিতে উঠে বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন।

সেমিনারীতে প্রবেশ করতে হলে স্থানীয় পালক-পুরোহিতের বিশেষ সুপারিশ প্রয়োজন ছিল। পালকপুরোহিত জানতেন যে অমল রীতিমতো খ্রিস্টযাগে যোগদান করে ও সেবক হয়। তাই ধর্মপল্লির পালকপুরোহিত খুব সুন্দর সুপারিশ করলেন অমলের জন্য। অমল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। সেমিনারী আর হলিক্রস হাই স্কুল ধরতে গেলে একই আঙ্গিনায় ছিল। স্কুলটি পরিচালনা করতেন হলিক্রস ব্রাদারগণ এবং সেমিনারীর পরিচালক ছিলেন হলিক্রস ফাদারগণ।

থিওটোনিয়াস অমল স্কুল ও সেমিনারীর জীবন একই সাথে চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং তা ভালোমতোই চলছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি থিওটোনিয়াস নাটকে অভিনয়, গান গাওয়া, ফুটবল খেলা ইত্যাদিতে খুবই আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। পড়াশোনার পাশাপাশি এসব দিকেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেমিনারীর নিয়মকানুন পালনের ব্যাপারে তিনি অনেক যত্নশীল ছিলেন। তাই সব পরিচালকগণও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। বরাবরের মতো সব ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করে বান্দুরা স্কুল থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে থিওটোনিয়াস উত্তর ভারতের রাঁচীর সেন্ট আলবার্ট সেমিনারীতে যোগ দেন। সেখানে তিনি দুই বছর জুনিওরেট কোর্স করেন। এরপর ১৯৪১-এর জুলাই থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুন পর্যন্ত ঐশতত্ত্ব পড়াশুনা করেন। মেধাবী, নম্র, বিনয়ী, ঈশ্বরভক্ত, প্রার্থনাশীল মানুষ হিসাবে সব সময় সকলের কাছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত বন্ধু। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রাঁচীর সেন্ট আলবার্ট সেমিনারীর পড়াশুনা শেষ করে ২৬শে জুন মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন।

অভিষিক্ত হয়ে ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ঢাকায় ফেরেন। এরপর তাঁকে নিজ ধর্মপল্লি হাসনাবাদে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। তাঁকে বান্দুরা সেমিনারীতে সহকারী পরিচালক হওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেখানে তিনি যেন সেমিনারীয়ানদেরকে কিছু ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দেন। অতি আনন্দের সাথে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করেন।

পাঠ ৩ : ফাদার গাঙ্গুলীর পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ

পবিত্র ক্রুশ সংঘের জন্ম হয়েছিল ফ্রান্স দেশে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই সংঘের যাজক, ব্রাদার ও সিস্টারগণ বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গে) এসেছিলেন ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। সেই থেকে তাঁরা এদেশে কাজ করতে শুরু করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশে তাঁরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন, অগণিত স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁরা স্থাপন করেন। ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ছোট বেলা থেকেই পবিত্র ক্রুশ যাজকদের দেখেছেন। তাঁদের তিনি দেখেছেন আপন ধর্মপল্লি হাসনাবাদে; দেখেছেন বান্দুরা সেমিনারীতে। যাজক হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গের জন্য তিনি ঈশ্বরের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি যাজক হয়েছেন। কিন্তু অন্য একটি বিষয় তাঁকে বিমোহিত করেছিল। সেটি হলো পবিত্র ক্রুশ যাজকদের সংঘবন্ধ জীবন। তাই তিনি পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে যোগ দিতে চেয়েও অনুমতি পাননি। কারণ দেশীয় যাজকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ খুব যত্নবান ছিলেন। কিন্তু তাঁকে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, কেউ যদি যাজক হওয়ার পরে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগ দিতে চায় সেটা যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প তেরেজা সেমিনারীতে তিনি এক বছর কাজ করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ তাঁকে পড়াশুনার জন্য পাঠান যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ফাদার থিওটোনিয়াস দর্শন শাস্ত্রে র উপর পড়াশুনা করে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রিও লাভ করেন। পড়াশুনা চলাকালে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করার। তিনি ঢাকার আর্চবিশপ মহোদয়ের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন। অবশেষে তিনি অনুমতি পেলেন।

পিএইচডি ডিগ্রি লাভের পর ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী পবিত্র ক্রুশ সংঘের নভিশিয়েটে প্রবেশ করেন। নভিশিয়েট তখন অবস্থিত ছিল নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই। এক বছর কঠোর নিয়মকানুন ও কৃচ্ছ্রসাধন করে ফাদার গাঙ্গুলীও ব্রত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তু ত হলেন। অতঃপর ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান অনুযায়ী দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য—এই তিনটি ব্রত গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি পবিত্র ক্রুশ সংঘভুক্ত হন। ব্রত গ্রহণ করে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

চিরব্রত গ্রহণ : নভিশিয়েট শেষে ব্রতগ্রহণবাণী উচ্চারণ করেছিলেন লাটিন ভাষায়। এরপর তিনি পর পর তিন বছর ব্রত নবীকরণ করেন। সেগুলোও লাটিন ভাষায়ই করেছিলেন। তিন বছর পূর্ণ হলে পর তিনি চিরব্রত গ্রহণ করেন। দিনটি ছিল ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর। সেদিন রমনা ক্যাথিড্রালে বিকাল তিনটায় এক জাঁকজমকপূর্ণ খ্রিষ্টযাগের মাধ্যমে ফাদার গাঙ্গুলীর চিরব্রত গ্রহণের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কাজ : দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তোমরা নিজ নিজ জীবনের আহ্বান পরস্পরের সাথে সহভাগিতা কর।

পাঠ ৪ : প্রেরণকর্মী ফাদার গাঙ্গুলীর কর্মজীবন

যীশু তাঁর যে শিষ্যদের বাণী প্রচার কাজে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বলা হতো প্রেরিত শিষ্য বা প্রেরিত দূত। বর্তমান কালেও প্রেরিত দূতদের সেই কাজগুলো মন্ডলী চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ডলীর কাজগুলো হলো প্রেরণকর্ম। ফাদার গাঙ্গুলী যেসব প্রেরণকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন সেগুলোর কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক) শিক্ষক হিসাবে ফাদার গাঙ্গুলী : প্রেরিত শিষ্যদের মতো ফাদার গাঙ্গুলীও ছিলেন একজন প্রেরণ কর্মী। তাঁকে যেখানে পাঠানো হতো সেখানেই যাওয়ার জন্য তিনি সদা প্রস্তু ত ছিলেন। পড়াশুনা ও নভিশিয়েট শেষে ফাদার গাঙ্গুলী স্বদেশে ফিরে এলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাজার সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজে ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে এক হৃদ্যতাপূর্ণ আনন্দঘন অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। সেই দিনই জানানো হয় যে, তিনি সেন্ট গ্রেগরীজ (বর্তমান নটর ডেম) কলেজে যুক্তিবিদ্যা পড়াবেন। চির চেনা স্বভাবের পরিচয় দিয়ে ফাদার গাঙ্গুলী নিজের কাজের দায়িত্বটি সানন্দে গ্রহণ করলেন।

যে মানুষটি পাওয়ার চাইতে দেওয়াতেই আনন্দ পান বেশি তিনি তো বসে থাকার পাত্র নন। শিক্ষকতা ছিল তাঁর একটি অতি আনন্দের বিষয়। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নিজের চেষ্টায় কলেজের ছাত্রদের সহশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একজন শিক্ষার্থী শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ডুবে থাক তা তিনি কখনো চাননি। তাই তিনি উদ্যোগ নিয়ে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই আগস্ট আর্চবিশপ গ্রেনারের প্রতিপালক সাধু লরেন্সের পার্বণ উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা মঞ্চায়িত করেছিলেন।

একসময় সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ লক্ষ্মীবাজার থেকে মতিঝিলে স্থানান্তরিত হয়। স্থানান্তরের সময় নির্মাণ কাজ তদারকিতে ফাদার গাঙ্গুলী নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি মতিঝিলে এসে নতুন নাম ধারণ করে। এখন এর নাম হয় নটর ডেম কলেজ। নটর ডেম কলেজের শুরু থেকে ফাদার গাঙ্গুলী জড়িত ছিলেন। কলেজে তিনি ফাদার টিম, সিএসসি-কে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাহায্য করতেন। একই সাথে তিনি বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো হলো : (ক) ডিরেক্টর অব স্টাডিজ, (খ) প্রিফেক্ট অব রিলিজিয়ন, (গ) লিজেন অব মেরী'র আধ্যাত্মিক পরিচালক, বাংলায় প্রকাশিত বুলেটিন 'মুকুর'-এর সম্পাদক ও প্রকাশক (ঘ) কলেজে ফাদারদের হাউজ কাউন্সিল সদস্য। তাছাড়া লাটিন ভাষায় প্রচুর দক্ষতা থাকায় সারা দেশে কলেজ পর্যায়ে লাটিন ভাষার প্রশ্ন তৈরির দায়িত্ব তিনি পেয়েছিলেন এবং দক্ষতা ও আনন্দের সাথে পালনও করেছেন।

ভাইস প্রিন্সিপাল এবং প্রিন্সিপাল ফাদার গাঙ্গুলী

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের ১ তারিখে ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে নটর ডেম কলেজের অস্থায়ী ভাইস প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হয়। কলেজের দায়িত্বের পাশাপাশি দেওয়া হয় সহকারী সুপিরিয়রের দায়িত্ব। একই মাসের ১৪ তারিখে কলেজের প্রধান নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি সবই সাদরে গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে পালন করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে তিনি 'Harvest' নামক একটি প্রকাশনার দায়িত্ব লাভ করেন। ঐ বছরেরই ২৯শে মে স্থায়ীভাবে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব লাভ করেন।

ফাদার গাঙ্গুলী অস্থায়ী অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল। একই বছর ৩০শে এপ্রিল তিনি স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রথম এদেশীয় একজন অধ্যক্ষ দ্বারা স্বনামধন্য নটর ডেম কলেজের নতুন যাত্রা শুরু হয়।

পালক হিসাবে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী

তখন নটর ডেম কলেজের ক্লাস বন্ধ থাকত সপ্তাহের শনিবার ও রবিবার। কলেজের রুটিন মাফিক কাজের অবসরে ফাদার গাঙ্গুলীসহ অন্য ফাদারগণ মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। বিশেষ করে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে যোগ দিয়ে যাজকীয় সেবাকাজ করতেন। এতে পুরোহিত হিসাবে নিজের মনের মধ্যে আলাদা একটা ঐশ অনুভূতি সজীব থাকত। অনেক সময় ধর্মপ্রদেশীয় ফাদারগণ নির্জনধ্যান ও অনান্য কাজে ধর্মপল্লির বাইরে যেতেন তখন ধর্মপল্লি খালি থাকত। বিশেষ করে এই সময়টায় নটর ডেম কলেজ থেকে ফাদারগণ গিয়ে রবিবারের খ্রিস্টযাগসহ অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেন।

ফাদার গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মধুর ও দরদী। তিনি ইংরেজি ও বাংলা গান স্বরলিপি দেখে গাইতে পারতেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল রমনা ক্যাথিড্রালে পুণ্য শনিবারের অনুষ্ঠানের গান তিনি পরিচালনা করেন। একই বছর রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লিতে ২৪শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির বড়দিন উৎসবেও গান গেয়ে পালক পুরোহিতকে সহায়তা করেন। সেই সময়ে দেশের রাস্তাঘাট ছিল খুবই খারাপ। একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে ভীষণ কষ্ট হতো। তখন মানুষ যাতায়াতের জন্য পায়ে হেঁটে, ঘোড়ার পিঠে বা বাইসাইকেলে চড়ে যাতায়াত করত। ফাদার গাঙ্গুলী সেই সময় বাইসাইকেলে চড়ে নাগরী, রাঙ্গামাটিয়া, মঠবাড়ী, ধরেন্ডা শুলপুর, গোলস্না, তুইতালসহ ভাওয়াল ও আঠারগ্রাম অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লিতে যাতায়াত করতেন। এইভাবে ফাদার গাঙ্গুলী নটর ডেম কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি পালকীয় কাজের দায়িত্ব নিয়ে অনেক জায়গায় গিয়েছেন। দুর্গম পথ বা প্রতিকূল আবহাওয়া তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

যুব গঠন কাজে গাঙ্গুলীর অবদান : ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী একজন কর্মপাগল ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কাজ করার মধ্যে তাঁর প্রচুর আনন্দ। তাই নটর ডেম কলেজে যুবকদের পড়াশুনা এবং সহকার্যক্রমে সহায়তা করা ছাড়াও যুব বয়সের স্বপ্নময় চিন্তা ও বাস্ত বতার কঠিনতম অধ্যায় নিয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে তাদের নিয়ে কাউন্সেলিং করতেন।

ফাদার গাঙ্গুলী সব সময় চেষ্টা করতেন কীভাবে যুবকদের নৈতিক গঠন বেশি জোরদার করা যায়। তাই তিনি যুবকদের সাথে থেকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর জোর দিতেন এবং আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে মনে সাহস যোগাতেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য নির্জন ধ্যান পরিচালনা করতেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এবং ২১শে আগস্ট দুই দিনব্যাপী এক নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন সেন্ট লরেন্স হোস্টেলের ছেলেদের জন্য।

মণ্ডলীতে যুবক-যুবতীদের সমস্যা নিয়ে তিনি নিজের উদ্যোগে একটি লিখিত প্রস্ত াবনা ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর রমনা ক্যাথিড্রালে অনুষ্ঠিত ধর্মপ্রদেশের পালক-পুরোহিতদের সভায় উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুলাই তিনি হোস্টেলের ছেলেদের জন্য আরও একটি নির্জন-ধ্যান পরিচালনা করেন।

পাঠ ৫ : বিশপ ও আর্চবিশপ পদে গাঙ্গুলী

বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি বিশপ গাঙ্গুলী

নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করার মাত্র চার দিনের মাথায়, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে তাঁকে বিশপ হওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি ঢাকায় এবং দেশের প্রায় সর্বত্রই মোটামুটি পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন কাজসহ অন্যান্য বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে সুবিবেচনা, নম্রতা, ভ্রাতৃপ্রেম, খ্রিষ্টতুল্য ধৈর্য ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ গুণ। তাঁর সুপিরিয়র এবং কলেজে কর্মরত সব ফাদার, শিক্ষক, অফিস সহকারী, শিক্ষার্থীবৃন্দ— সকলেই তাঁর চরিত্রের নানাবিধ গুণ লক্ষ করেছেন এবং তিনি যে ভবিষ্যতে অনেক বড় দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম তাও সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সকলেই তাঁকে নিয়ে এই স্বপ্ন দেখছিল যে, গাঙ্গুলী খুব শীঘ্রই মণ্ডলীর একটি বড় দায়িত্ব লাভ করতে যাচ্ছেন। এ কারণে ক্রমান্বয়ে তাঁর উপর বড় বড় দায়িত্বভারও অর্পণ করা হচ্ছিল। অচিরেই দেখা গেল সকলের স্বপ্ন বাস্ত বে রূপ নিতে লাগল।

বিশ্বব্যাপী সকল বাঙালির মধ্যে মণ্ডলীর প্রথম বিশপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী। বিশপ হিসেবে তাঁর নির্বাচিত হওয়া, বিশপ পদে অভিষিক্ত হওয়া, আর্চবিশপ হওয়া ইত্যাদি বিষয় মণ্ডলীর ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি বিশপ গাঙ্গুলী

ঐ মুহূর্তে দেশি-বিদেশি সকলের কাছেই এটি একটি অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব বিষয় ছিল বলে আনন্দের আর শেষ ছিল না।

এই শুভ বার্তাটি পাকিস্ত ান অবজারভারে এবং রোমের পত্রিকা অবজারভাতোরে রোমানো-তে প্রকাশিত হলো। আরও জানানো হলো যে, কার্ডিনাল আগাজিনিয়ান স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অক্টোবরের ৭ তারিখে গাঙ্গুলীকে বিশপ পদে অভিষিক্ত করবেন। দেখতে দেখতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর এসে গেল। কার্ডিনাল আগাজিনিয়ানও ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। অসংখ্য যাজক, ব্রাদার, সিস্টার, দেশি ও বিদেশি অতিথিবর্গ এবং খ্রিষ্টভক্তের উপস্থিতিতে রমনা ক্যাথিড্রালে ভীষণ গরম আবহাওয়ার বিকালে অনুষ্ঠিত হলো গাঙ্গুলীর বিশপ হওয়ার অনুষ্ঠান।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লি, নটর ডেম কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নব অভিষিক্ত গাঙ্গুলীকে অভ্যর্থনা জানান হলো। এবার শুরু হলো তাঁর কাজের পালা। তাঁর প্রথম দায়িত্ব হলো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপের দায়িত্ব পালন করা। এসময় ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ইত্যাদি মান্দিদের উপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু হয়। এতে ঢাকার আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করেন। এর ফলস্বরূপ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আর্চবিশপ গ্রেনারকে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়।

আর্চবিশপ পদে গাঙ্গুলী

আর্চবিশপ গ্রেনার দেশ থেকে চলে গেলেও তিনি আশায় ছিলেন, সরকার তাঁকে আবার ফিরে আসার সুযোগ দিবে। তাই পোপ মহোদয় তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আর্চবিশপের পদ থেকে সরে না যান। এদিকে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। আর্চবিশপ গ্রেনারের আর এদেশে ফেরার সুযোগ হলো না। অবশেষে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তিনি পদত্যাগপত্র পোপ মহোদয়ের কাছে জমা দিলেন। আর সেদিন থেকেই আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের স্থায়ী আর্চবিশপ পদে বহাল হলেন। তবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলো ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি তারিখে। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ খুব সুন্দরভাবেই পরিচালিত হতে লাগল।

অনেক বছর যাবৎ মণ্ডলীর কর্ণধার ছিলেন বিদেশি। এখন স্বদেশি নেতৃত্ব শুরু হলো। এতে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে কিছু কিছু কঠিন মুহূর্তে পড়তে হয়। কঠিন সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান একটি দিক ছিল মণ্ডলীর কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট টাকাপয়সার অভাব। তা সত্ত্বেও তিনি শক্ত হাতে মণ্ডলী পরিচালনা করেন। তিনি অতি সহজ সরল ব্যক্তি ছিলেন। সহজে কাউকে তিনি আঘাত দিতে পারতেন না। কারও সাথে তিনি কোনোদিন রাগ করেননি। এই কারণে অনেকে তাঁকে বেশি ভালো চোখে দেখতেন না। এসব কারণে তিনি একটু চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি ঈশ্বর তাঁকে এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। কাজেই ঈশ্বর তাঁকে একাকী ছেড়ে দেননি।

পাঠ ৬ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকেরই জানা আছে। সেই যুদ্ধকলীন দিনগুলোতে, জাতির সেই সংকটকালে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী অতিশয় সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাধারণ নির্বাচনে হেরেও ক্ষমতা ছাড়েনি। উল্টো পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা, সম্পদ লুটপাট, জ্বালাও-পোড়াও আরম্ভ করে। প্রাণের ভয়ে আশ্রয়হীন লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মানুষ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকল। ঠিক সেই ক্রান্তিলগ্নে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের কাছে একটি জরুরি পরিপত্র পাঠালেন। এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, জাতির এই বিপদ মুহূর্তে আমাদের নীরব হয়ে বসে থাকা যাবে না। মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য সবাইকে কাজে নেমে পড়তে হবে। তিনি বলেছিলেন সকল বিদ্যালয়ে যেন গৃহহারা কষ্টভোগী মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয়।

তিনি আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান খ্রিস্টমণ্ডলীর পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত বিবৃতি প্রস্তুত করে পাকিস্তান সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। সরকারকে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার আবেদন জানান হবে। তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তান গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যাবার পর তাঁকে বলা হয় যে, এই ধরনের পদক্ষেপে সরকার বরং খ্রিষ্টানদের উপর আরও ক্ষেপে যেতে পারে। তাই তিনি ফিরে আসেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অগণিত মানুষের দুঃখদুর্দশা ও নির্যাতনের কথা আর্চবিশপ গাঙ্গুলী পোপ ষষ্ঠ পলকে জানিয়েছিলেন। পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পল ক্যাথলিক বিশপস কনফারেন্স অব ইস্ট পাকিস্তান–এর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর নিকট লিখিত এক পত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিশপ, পুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী/ব্রতিনী ও জনগণের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিলেন এবং আন্তর্জাতিক নেতৃবর্গের কাছে এই ধরনের যুদ্ধের অবসানের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

পোপ ষষ্ঠ পল পুনরায় এক বার্তায় সারা বিশ্বের মানুষের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন ১০ই অক্টোবর, রবিবার, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করতে। তিনি এখানে ঘটতে থাকা জঘন্য অপরাধের জন্য গভীর অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যও সকলকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সেই মোতাবেক ৫ই অক্টোবর লিখিত এক চিঠি দিয়ে সব ধর্মপল্লির ফাদারদের কাছে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন সকল ধর্মপল্লিতে পোপ মহোদয়ের এই উদ্দেশ্য অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কৌশলগত অবদানের ফলে যুদ্ধকালীন সময়ে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষই বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আসে শান্তির বার্তা নিয়ে সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়, বাঙালি জাতির গৌরবময় মুক্তির বিজয়। দেশের মানুষের মন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

আমাদের মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে অবশেষে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সহায়তা করেছিল ভারত। এ কারণে মাত্র ৯ মাসে আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়েছিল। বিজয় লাভের পরও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এবং সব কিছু শান্ত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী অন্তত এক মাস আমাদের দেশে অবস্থান করেছিল। ঐ সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আর. এন. মিস্রা। এই সময়ে সর্বত্রই আনন্দের সুবাতাস বয়ে চলছিল। সদ্যোজাত বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীতে তখন দ্বিগুণ আনন্দ– একদিকে বড়দিনের মহানন্দ এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের উল্লাস। আর্চবিচশপ গাঙ্গুলী পঞ্চম বিশ্বশান্তি দিবস উপলক্ষে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীকে যৌথভাবে সংবর্ধনার আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের বেশ কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তি, মন্ত্রীবর্গ, অফিসার ও সৈন্য এবং ভারতের ব্রিগেডিয়ার আর এন মিস্রাসহ বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধনা প্রদান এবং পঞ্চম বিশ্ব শান্তিদিবসকে কেন্দ্র করে লিখিত একটি বক্তব্য পাঠ করেন।

বক্তব্যের মধ্যে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বলেন, "গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে আমি ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমাদের মুক্তিবাহিনীর জওয়ানদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ আপনারা আমাদের বাংলাদেশে স্বস্তি ও

শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আজ আনন্দে আপ্লুত হয়ে আপনাদেরকে আমরা আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে বরণ করে নিচ্ছি; যাঁরা আমাদের দেশে ন্যায্যতা ও শান্তি আনয়নের জন্য অকাতরে জীবন দান করেছেন আমরা কী করে আজ তাঁদের ভুলে থাকি? আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁদেরকে যোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করুন।"

পাঠ ৭ : অনন্ত যাত্রা

আর্চবিশপ গাঙ্গুলী সর্বদাই মনে রাখার চেষ্টা করতেন, একদিন তাঁকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হতে হবে। যে ব্রত নিয়ে তিনি একজন পুরোহিত ও পরে সন্ন্যাসব্রতী হয়েছিলেন, যে প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তা বিশ্বস্ত ভাবে পালন করার জন্য তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেই হবে। আজ শেষ হয়েছে তাঁর সেই যাত্রা, সেই অবিরাম লক্ষ্যের পানে ধেয়ে চলা। যে কর্তব্যভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল তা তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমাধান করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অনেকবার অসুস্থ হয়ে পড়লেও আবার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, আবার মনে এনেছেন তাঁর কাঁধে ন্যস্ত কর্তব্যকর্মের কথা। অনেকবার হতাশাগ্রস্ত হলেও বারবার প্রার্থনার দ্বারা মনে আশা ফিরিয়ে এনেছেন।

প্রতিদিনই তিনি খ্রিষ্টযাগ ও ধ্যান-প্রার্থনায় প্রভুর দূতের হাত থেকে খাদ্য ও পানীয় খেয়েছেন এবং এভাবে তাঁর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। আজ তাঁর পথযাত্রা শেষ হলো। পরমেশ্বরের কোলে তাঁর অনন্ত বিশ্রামের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ার সময় আজ এসে গেছে। এবার শত চেষ্টা করেও, কানফাটানো চিৎকার করেও কেউ তাঁকে আর সজাগ করতে পারবে না। তাঁর পাশাপাশি যাঁরা পথ চলেছেন, একযোগে কাজ করেছেন তাঁরাও কোনো কিছুই অনুমান করতে পারেননি। হঠাৎ করে থেমে গেল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। তাই তিনি বিদায়মূলক কোনো কিছুই বলে যেতে পারলেন না। কারও জন্য কোনো সান্ত্বনার বাণী দিয়ে যেতে পারলেন না।

আর্চবিশপের মৃত্যুর ক্ষণটিতে ফাদার চার্লস গিলেস্পি, সিএসসি এবং সিস্টার প্রজ্ঞা, এসএমআরএ কাছে ছিলেন। ফাদার গিলেস্পির লেখা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, বিকেল আনুমানিক ৩.৪৫ মিনিটের সময় আর্চবিশপ গাঙ্গুলী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুকে ভীষণ ব্যথা অনুভব করেন। ফাদার গিলেস্পি ও সিস্টার প্রজ্ঞা গাড়িতে করে আর্চবিশপকে নিয়ে রওনা দেন হাসপাতালের উদ্দেশে। পথেই তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তাঁর মৃত্যুতে সারা দেশের খ্রিস্টান সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমাদের দেশের সব বিশপ তখন ঢাকায় আসেন। অগণিত ভক্তসাধারণও তাদের প্রিয় আর্চবিশপকে এক নজর দেখার জন্য ঢাকায় এসে জমা হয়। পরদিন, ৩রা সেপ্টেম্বর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে মহা খ্রিষ্টযাগ অর্পণ করা হয়। প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন তখনকার খুলনার বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও, সিএসসি এবং উপদেশ দিয়েছিলেন ফাদার টমাস জিমারম্যান, সিএসসি। পরে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে আর্চবিশপ ভবনের সামনেই সমাধিস্থ করা হয়।

পাঠ ৮ : ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, সিএসসি। তিনি শুধু লেখাপড়ায় প্রতি শ্রেণিতেই প্রথম হননি, প্রতিটি কাজে, দায়িত্ব-কর্তব্যে, ব্রতীয় জীবনে, মানুষের সাথে সম্পর্ক ও সহযোগিতায় তিনি ছিলেন আন্তরিক। তিনি সাহস ও প্রজ্ঞায়, চিন্তা-চেতনায়, বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সকল কিছুতেই ছিলেন সবার প্রিয়। যে কেউ একবার তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন তিনি তাঁর বিষয়ে জীবন্ত সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করলেন মহামনীষী আর্চবিশপ গাঙ্গুলী। মৃত্যু এসে ভক্তদের মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলতে পারেনি। এখনও প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুদিবস এলে শত শত ভক্ত ভিড় করে তাঁর সমাধিস্থলে। তাঁর মৃত্যুর পর নটর ডেম কলেজের নতুন ভবনের নামকরণ করা হয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর নামে। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক স্থাপিত একমাত্র টিচার্স ট্রেনিং কলেজটির নামকরণ কর হয় আর্চবিশপ টি, এ, গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হিসাবে। দিনে দিনে তাঁর প্রতি ভক্তদের ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাটি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ পরম শ্রদ্ধেয় পৌলিনুস কস্তা জনগণের পক্ষ থেকে পোপ মহোদয়ের সাধু-সন্ত বিষয়ক বিভাগের কাছে তুলে ধরেন। একই সাথে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে সাধুশ্রেণিভুক্ত করণের প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন করেন।

পোপ মহোদয়ের সাধু-সন্ত বিষয়ক বিভাগের দৃষ্টিতে বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত হয়। স্বর্গীয় আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভক্ত জনগণের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর আর্চবিশপের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পোপ মহোদয়ের অনুমোদনে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রয়াত আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে দেওয়া হয় এক বিশেষ উপাধি– 'ঈশ্বরের সেবক'।

২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর 'ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী'র ধন্য শ্রেণিভুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এই কমিটি ধন্যশ্রেণিভুক্ত হওয়ার কাজ এগিয়ে নিবেন। আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর তাঁর এই ভক্তসাধককে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সর্বত্র মহিমান্বিত করুন।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী হস্ত র্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন ... খ্রিষ্টাব্দে।

২. সেমিনারীতে প্রবেশ করতে হলে স্থানীয় পালক পুরোহিতের বিশেষ ... প্রয়োজন ছিল।

৩. যীশু তাঁর যে শিষ্যদের বাণী প্রচার কাজে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বলা হতো ...।

৪. প্রেরিত শিষ্যদের মতো ফাদার গাঙ্গুলীও ছিলেন একজন ...।

৫. নটর ডেম কলেজের শুরু থেকে ফাদার ... জড়িত ছিলেন।

বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. ঈশ্বর থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে	• মন্ডলীর কর্তৃপ খুব যত্নবান ছিলেন
২. দেশীয় যাজকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য	• মন্ডলীর প্রধান করে পাঠালেন
৩. ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে প্রবেশ	• ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে
৪. মন্ডলীর কাজগুলো হলো	• প্রেরণকর্ম
৫. আর্চবিশপ গাঙ্গুলী বাঙালিদের মধ্যে	• ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে
	• প্রথম বিশপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ১৯১৮ খ. ১৯২০

গ. ১৯২১ ঘ. ১৯২২

২. মন্ডলী আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে 'ঈশ্বরের সেবক' উপাধি দেওয়ার কারণ কী?

ক. চতুরতা খ. দূরদর্শিতা

গ. চঞ্চলতা ঘ. বিশ্বস্ত তা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সুমন মেধাবী ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই তার লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ সঠিক সময়ে করে। স্কুলের অনুষ্ঠানে গান, অভিনয়, নাটক, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্কুলের ও পরিবারের সব কাজকর্ম যথাসময়ে করে থাকে এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে।

৩. সুমনের মধ্যে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—

i. শৃঙ্খলাবোধ

ii. দূরদর্শিতা

iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

৪। সুমনের গুণের দ্বারা সুমন হয়ে উঠতে পারে—

ক. জীবনে প্রতিষ্ঠিত   খ. বন্ধুভাবাপন্ন

গ. আলোচনার পাত্র   ঘ. করুণার পাত্র।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সেরন একজন সমাজকর্মী। তিনি পঞ্চগড় জেলায় গিয়ে লক্ষ করলেন যে, সেখানকার ১৫-২৩ বছরের ছেলেমেয়েরা অবাধে চলাফেরা করে। গির্জার প্রার্থনা বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয় না। নেশা, হাসি-তামাশা, চাঁদাবাজি, কলহ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এদের উন্নতির জন্য তিনি একটি 'সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছেলেমেয়েদের নৈতিক উন্নতির জন্য প্রতি মাসে সেমিনারের আয়োজন করেন এবং তাদের গির্জায় প্রার্থনা, ধ্যান এবং পারিবারিক প্রার্থনা, ধ্যান ও নির্জন ধ্যানের ফল সম্পর্কে শিক্ষা দেন। মাঝে মাঝে তিনি নির্জন ধ্যানের ব্যবস্থাও করে থাকেন। এতে ছেলেমেয়েরা আসল জীবনের পথ খুঁজে পায়।

ক. বাংলাদেশের প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ কে?

খ. আর্চবিশপ গ্রেনার স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন কেন?

গ. সেরন টিএ গাঙ্গুলীর কোন কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজগুলো করেছিল?

ঘ. সেরন ও টিএ গাঙ্গুলীর কাজের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. দরিদ্র পরিবারের জন্ম নেয় জন। ছোটবেলা থেকেই তিনি সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন। প্রচুর মেধা ও প্রতিভা ছিল তাঁর মধ্যে। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক অনুপ্রেরণা, সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন। এর পর তিনি 'কল্যাণ সংঘ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সংঘের মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, সাহায্য এবং ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা। এ কাজের পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মপ্রচার করেন। এতে যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই উপকৃত হয়। তার এ কাজে খুশি হয়ে খ্রিস্টান সমাজের প্রত্যেকেই একমত হয়ে তাকে 'খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' এর প্রধান করে দেয়।

ক. কত সালে ফাদার গাঙ্গুলীকে নটর ডেম কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়?

খ. প্রতিকূল আবহাওয়া ফাদার গাঙ্গুলীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি কেন?

গ. ফাদার গাঙ্গুলীর কোন দিকটি জনের মধ্যে লক্ষ করা যায়– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. খ্রিস্টমণ্ডলী জনের মধ্যেই টিএ গাঙ্গুলীকে দেখতে পায়– উক্তিটির সাথে কি তুমি একমত? তোমার মতামত দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মণ্ডলী বিশপ থিওটোনিয়াসকে কেন 'ঈশ্বরের সেবক' উপাধি দিয়েছিল?

২. আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর শৈশব জীবন সম্পর্কে লেখ?

৩. আর্চবিশপ গ্রেনারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফাদার গাঙ্গুলী কীভাবে পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশ করলেন বর্ণনা কর।

২. শিক্ষা বিস্ত ার ও যুব গঠনে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর অবদান বর্ণনা কর।

৩. মুক্তিযুদ্ধে আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর ভূমিকা লিপিবদ্ধ কর।

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮–খ্রিষ্টধর্ম

অন্তরে যারা পবিত্র–ধন্য তারা
–বাইবেল

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :